কাব্যজিজ্ঞাসা

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়
২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন ১৩৩৫
দ্বিতীয় সংস্করণ : আষাঢ় ১৩৪৮
পুনর্মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৩৫১
অগ্রহায়ণ, ১৩৫৫

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা
মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য
তাপসী প্রেস, ৩০ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা

ভূমিকা

১৩৩৩ সালের সবুজপত্রে কাব্যজিজ্ঞাসা নামে আমার যে-কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশ হয়েছিল, এ বইখানি, উল্লেখযোগ্য কোনো পরিবর্তন না করে, সেই প্রবন্ধগুলির একত্র সংগ্রহ মাত্র।

এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলিতে সংস্কৃত আলংকারিকদের মতামত অবলম্বনে কাব্য সম্বন্ধে কয়েকটি মূল প্রসঙ্গের আলোচনার চেষ্টা করেছি। বইখানি আলোচ্য বিষয়গুলি সম্পর্কে আলংকারিকদের মতবাদের সমষ্টি নয়। কারণ, প্রায় প্রতি বিষয়ে নানা আলংকারিকের নানা মত; কিন্তু এ গ্রন্থে কেবল সেইসব মত ও কথা উদ্ধৃত ও আলোচনা করেছি, যা আমার নিজের মনে লেগেছে। বিরুদ্ধ মতের যেখানে উল্লেখ করেছি, সে কেবল গ্রাহ্য মতকে পরিস্ফুট করার জন্য।

বলা হয়তো বাহুল্য যে, কাব্য সম্বন্ধে আলংকারিকদের যতসব আলোচ্য বিষয় ছিল, তার সকলগুলি আমার গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় নয়। আমাদের এ যুগের লোকের মনে কাব্য সম্বন্ধে যে-সব প্রধান জিজ্ঞাসা— এ গ্রন্থে কেবল তারই আলোচনা করেছি। আলংকারিকেরা এমন অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন, যাতে আমাদের কোনো কৌতূহল নেই। কারণ, কালভেদে কেবল মীমাংসার পরিবর্তন ঘটে না, প্রশ্নেরও বদল হয়। কিন্তু কাব্যবস্তু এক ব'লে যে-সব জিজ্ঞাসা আমাদের মনে উঠছে, তার অনেকগুলিই অনেক আলংকারিকের মনেও উঠেছিল, এবং কোনো কোনো আলংকারিক তাদের যে বিচার ও মীমাংসা করেছেন, তা বিশ্লেষণের নিপুণতায় ও অন্তর্দৃষ্টির গভীরতায় কাব্যতত্ত্বের প্রাচীন বা নবীন কোনো আলোচনার চেয়ে কম উপাদেয় নয়। সংস্কৃত আলংকারিকদের সেই বিচার ও মীমাংসার কিছু পরিচয় দিতে এই গ্রন্থে প্রয়াস করেছি। সেজন্য তাঁদের নানা স্থানে ছড়ানো মত ও কথাকে এক সঙ্গে সাজিয়ে গাঁথতে হয়েছে, যার সুতোটি আমার। মাঝে মাঝে তাঁদের কথাকে প্রাচীন পরিচ্ছদ ছাড়িয়ে হালের পোশাকও পরাতে হয়েছে। কিন্তু জ্ঞানতঃ তাঁদের মত ও কথাকে বিকৃত ক'রে আধুনিক মত ও কথার সঙ্গে মিলিয়ে দিতে চেষ্টা করি নি। যদি তাঁদের কথা ও মত পাঠকের কাছে খুব আধুনিক রকমের বলে মনে হয়, তার কারণ, আমরা আধুনিকেরা যে-প্রশ্নের যে-প্রণালীতে বিচার করছি, প্রাচীন আলংকারিকেরাও সেই প্রশ্নের ঠিক সেই প্রণালীতে বিচার

করেছিলেন। তাঁদের পরিভাষা ও প্রকাশভঙ্গি ভিন্ন, কিন্তু তাঁদের বক্তব্য এক।

উলটো রকমের সন্দেহের বিরুদ্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন। এ গ্রন্থে আলংকারিকদের সংস্কৃত বচন ক্রমাগত তুলেছি, সংস্কৃত কবিদের কাব্য থেকে বহু উদাহরণ নিয়েছি— বেশির ভাগ আলংকারিকদের দেওয়া, কতক আমার নিজের। এ থেকে যদি কেউ সন্দেহ করে যে, এ গ্রন্থের আলোচিত কাব্যতত্ত্ব কেবলমাত্র সংস্কৃত কবিদের কাব্যের তত্ত্ব, এবং সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের বাইরে সে তত্ত্বের কোনো প্রয়োগ নেই— তবে আশ্চর্য হওয়া হয়তো অনুচিত; যদিচ ইংরেজ কাব্যসমালোচকদের ইংরেজি বচন তুলে ইংরেজ কবিদের কাব্য থেকে উদাহরণ দিয়ে লিখলে এ সন্দেহ কারও হত না যে, মীমাংসাগুলি কেবল ইংরেজী কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধেই সত্য, আর কোনো কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে নয়। সংস্কৃত আলংকারিকদের যে-সব কথা ও মতামতের আলোচনা করেছি, তা যদি সকল কাব্যসাহিত্যে সমান প্রযোজ্য না হত, তবে সেগুলি হত প্রত্নতাত্ত্বিকের আলোচ্য এবং আমাদের মতো 'এমেচিয়র'-এর বিভীষিকা। তাঁদের আলোচনা ও মীমাংসা বিশ্বজনীন, ও সকলকাব্যসাধারণ— এই বুদ্ধি ও বিশ্বাসেই তার পরিচয় দিতে উৎসাহিত হয়েছি। যদি সে পরিচয়ে পাঠকের অন্য রকম ধারণা হয়, সে ত্রুটি আমার, সংস্কৃত আলংকারিকদের বা কবিদের নয়। মানুষ বিশেষকে পরীক্ষা করেই সাধারণকে পায়, কারণ সাধারণ হচ্ছে যা নানা বিশেষের মধ্যে সাধারণ। সেজন্য সকল বিশেষকে পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না, এবং তা অসম্ভব। যার দৃষ্টি আছে, সে একটি বিশেষকে পরীক্ষা করেই সাধারণকে ধরতে পারে। সংস্কৃত কবিদের কাব্যে যদি কাব্যত্ব থেকে থাকে, আর সংস্কৃত আলংকারিকদের যদি তত্ত্বদর্শিতার অভাব না থেকে থাকে, তবে, বিশ্বসাহিত্যের খবর না রেখেও, আলংকারিকদের সকল কাব্যের মূলতত্ত্ব আবিষ্কারের মধ্যে সন্দেহের কিছু নেই। যেমন ইংরেজ সমালোচকেরা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের কোনো খবর না রেখেও সকলকাব্য-সাধারণ কাব্যত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। অ্যারিস্টটল্ 'পইটিক্স' লিখেছিলেন, কিন্তু গ্রীক কাব্য-সাহিত্য ছাড়া আর কোনো কাব্যসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল না। সবুজপত্রে যখন এই গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি প্রকাশ হয়, তখন দু-একজন পণ্ডিত লোক তাদের আলোচনার বিশ্বজনীনত্বে সন্দেহ করেছিলেন— তাই এ কথাগুলি বলতে হল।

এ গ্রন্থে দু-জন আলংকারিকের লেখার উপরে প্রধানতঃ নির্ভর করেছি— আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্ত। এঁরা দু-জনই কাশ্মীরের অধিবাসী ছিলেন। আনন্দবর্ধন সম্ভবত খ্রীষ্টীয় নবম শতকের মধ্যভাগের লোক। তিনি সুপ্রসিদ্ধ ধ্বন্যালোক গ্রন্থের 'বৃত্তি' অংশের লেখক। ধ্বন্যালোক গ্রন্থখানি অন্যান্য অনেক অলংকারের পুঁথির মতো কারিকা ও তার বৃত্তির সমষ্টি। এই কারিকা ও বৃত্তি সাধারণতঃ হয় এক লেখকের লেখা। লেখক কারিকায় বক্তব্য সংক্ষেপে বলে বৃত্তিতে তার আলোচনা ক'রে তাকে বিশদ করেন। কিন্তু সহজেই প্রতীতি হয় যে, ধ্বন্যালোকের কারিকার শ্লোক ও বৃত্তির আলোচনা এক লোকের লেখা নয়। এই বৃত্তিতে আনন্দবর্ধন 'ধ্বনিবাদ'-এর মতটিকে পূর্ণাঙ্গ করে গড়ে তুলেছেন, কিন্তু কারিকার শ্লোকগুলিতে কোনো বিশেষ মত খুব শক্ত দানা বাঁধে নি। একটি পরম রসগ্রাহী মনের গভীর অনুভূতি এই কারিকাগুলিতে প্রকাশ হয়েছে। এর এক-একটি শ্লোক উজ্জ্বল দীপশিখার মতো পাঠকের মন আলোতে ভরে দেয়। আমার এই ক্ষুদ্র গ্রন্থেই পাঠক তার অনেক উদাহরণ পাবেন। কিন্তু এই সহৃদয় লেখকের নাম পর্যন্ত আমাদের অজ্ঞাত, এবং একাদশ খ্রীস্টাব্দের শেষভাগ থেকে সংস্কৃত আলংকারিক সমাজেও অজ্ঞাত ছিল মনে হয়; কারণ, অনেক আলংকারিক আনন্দবর্ধনকেই কারিকার লেখক বলে উল্লেখ করতে দ্বিধা করেন নি। সম্ভবতঃ বৃত্তিকার আনন্দবর্ধনের পাণ্ডিত্যের খ্যাতির নীচে এই রসজ্ঞ কারিকাকারের নাম চাপা পড়ে গেছে। কিন্তু ধ্বনিবাদের ইমারতের অনেক পাণ্ডিত্যের ইট আজ খসে পড়লেও, এই কারিকাগুলির জ্যোতি অনির্বাণ রয়েছে। এই অজ্ঞাতনামা রসিকশ্রেষ্ঠের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা ও প্রীতি নিবেদন করছি।

অভিনবগুপ্তের নিজের লেখা থেকেই জানা যায় যে, তিনি খ্রীস্টাব্দের দশম শতকের শেষ ভাগের ও একাদশ শতকের প্রথম ভাগের লোক। তিনি বহুশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং শৈবদর্শন সম্বন্ধে নানা পুঁথি লিখে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। কাব্যতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর দুখানি প্রধান গ্রন্থ হচ্ছে ধ্বন্যালোকের লোচন নামে টীকা, এবং ভরতনাট্যশাস্ত্রের অভিনবভারতী নামে সুবিস্তৃত বিবৃতি বা ভাষ্য। আমার এই গ্রন্থে ধ্বন্যালোকের টীকা থেকেই অভিনবগুপ্তের মত ও লেখা তুলেছি। যে রসবাদ সংস্কৃত আলংকারিকদের কাব্যজিজ্ঞাসার চরম মীমাংসা, অভিনবগুপ্ত তার সর্বপ্রধান আচার্য। যে তত্ত্ব পূর্বে অস্ফুট, অস্বব্যক্ত ও অপূর্ণাঙ্গ ছিল, আচার্য অভিনবগুপ্ত তাকে অনবদ্য সর্বাঙ্গ রূপ দিয়ে

রসিকসমাজে পরিস্ফুট ও প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ পুঁথিতে ধ্বন্যালোকলোচন থেকে তাঁর যে-সব রচনা উদ্‌ধৃত করেছি, তা থেকেই পাঠক অভিনবগুপ্তের চিন্তার তীক্ষ্ণতা, বিশ্লেষণক্ষমতার নৈপুণ্য ও রসদৃষ্টির গভীরতার পরিচয় পাবেন। তাঁর অপর গ্রন্থ অভিনবভারতী এতদিন দুষ্প্রাপ্য ছিল। সম্প্রতি Gaekwad's Oriental Series-এ শ্রীযুক্ত মনবল্লী রামকৃষ্ণ কবি মহাশয় অভিনবভারতী সমেত ভরতনাট্যশাস্ত্র চার খণ্ডে প্রকাশ করছেন। তার প্রথম খণ্ড প্রকাশ হয়েছে; এবং নাট্যশাস্ত্রের যে ষষ্ঠ অধ্যায়ে রসের পরিচয় ও বিচার আছে, অভিনবগুপ্তের ভাষ্য সহ সেই 'রসাধ্যায়' এই খণ্ডেই ছাপা হয়েছে। কাব্যতত্ত্বজিজ্ঞাসুদের পক্ষে এটি আনন্দের সংবাদ। কিন্তু অভিনবভারতীর যে কয়খানি মূল পুঁথি কবি মহাশয় পেয়েছেন, তার একখানিও সম্পূর্ণ পুঁথি নয়, এবং সবগুলিই এত ভ্রমপূর্ণ যে, তা থেকে অনেক জায়গায় প্রকৃত পাঠ নির্ণয় অসম্ভব। কবি মহাশয় রহস্য করে বলেছেন যে, স্বয়ং অভিনবগুপ্ত স্বর্গ থেকে নেমে এলেও এ-সব পুঁথি থেকে তাঁর মূলপাঠ উদ্ধার করতে পারতেন না। সে যা হোক, আমাদের মতো অপণ্ডিত লোকের কাজ ওতেই অনেকটা চলে। কারণ, অভিনবগুপ্তের মনের কথাটা মোটামুটি ও থেকে ধরা যায়।

এই ভূমিকায় আনন্দবর্ধন ও অভিনবগুপ্তের যে দেশকালের খবর দিয়েছি, তা সংগ্রহ করেছি শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে প্রণীত *Studies in the History of Sanskrit Poetics* গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে। সেজন্য তাঁর কাছে আমার ঋণ স্বীকার করছি। কৌতূহলী পাঠক সুশীলবাবুর গ্রন্থে ঐ দুই আলংকারিকের আরও কিছু পরিচয় পাবেন।

আমার এই ক্ষুদ্র পুঁথিখানি বাঙালি রসিক ও ভাবুক সমাজে উপস্থিত করে প্রার্থনা করছি যে, আমাদের দেশের নবীন ও প্রাচীন রসজ্ঞদের মধ্যে চিত্তের যোগ স্থাপিত হোক।

আশ্বিন ১৩৩৫

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত

কাব্যজিজ্ঞাসা

ধ্বনি

ইহুদি ও খ্রীস্টানের ধর্মপুঁথিতে বলে, বিধাতাপুরুষ তাঁর আকাঙ্ক্ষার বলে দ্যৌঃ পৃথিবী, আলো অন্ধকার, সূর্য চন্দ্র সব সৃষ্টি করলেন, এবং সৃষ্টির পর দেখলেন যে, সে-সৃষ্টি অতি চমৎকার। ঐ পুরাণেই বলে, সৃষ্টিকর্তা মানুষকে তৈরি করেছেন তাঁর প্রতিরূপ করে, আর নিজের নিশ্বাসবায়ুতে তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। অর্থাৎ, মানুষ যেখানে স্রষ্টা তার সৃষ্টির রহস্য বিশ্বসৃষ্টিরহস্যেরই প্রতিচ্ছায়া : অথবা, যা একই কথা, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ছাড়া সৃষ্টিতত্ত্ব আয়ত্তের আর কোনো চাবি মানুষের হাতে নেই। বাইবেলের বিধাতার মতো মানুষ অন্তরাত্মার আকাঙ্ক্ষার চালনায় যা সৃষ্টি করে তার চমৎকারিত্ব তার নিজেকেই বিস্মিত করে দেয়। বাহিরের বিশ্বের স্বরূপ ও সৃষ্টিকৌশল আবিষ্কারে যেমন মানুষের বুদ্ধির বিরাম নেই, নিজের সৃষ্টির স্বরূপ ও কৌশলের জ্ঞানেও তার ঔৎসুক্যের সীমা নেই। কেননা, সে-সৃষ্টিও মানুষের বুদ্ধির কাছে বাহিরের বিশ্বের মতোই রহস্যময়।

রামায়ণে কাব্যের জন্মকথার যে কাব্যেতিহাস আছে, তাতে মানুষের সৃষ্টির এই তত্ত্বই কাব্যসৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হয়েছে। ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব-বিয়োগের শোকে যখন বাল্মীকির মুখ থেকে "মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং" ইত্যাদি বাক্য আপনি উৎসারিত হল তখন—

> তস্যৈথং ব্রুবতশ্চিন্তা বভূব হৃদি বীক্ষতঃ।
> শোকার্তেনাস্য শকুনেঃ কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া॥

'বীক্ষণশীল মুনির হৃদয়ে চিন্তার উদয় হল, শকুনির শোকে শোকার্ত হয়ে এই যে আমি উচ্চারণ করলেম— এ কী।' তখন নিজের প্রজ্ঞা দিয়ে তিনি এর প্রকৃতি চিন্তা করতে লাগলেন—

> চিন্তয়ন্স মহাপ্রাজ্ঞশ্চকার মতিমান্মতিম্।

এবং শিষ্যকে বললেন—

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয়সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা॥

এই বাক্য পাদবদ্ধ, এর প্রতি পদে সমাক্ষর, ছন্দের তন্ত্রীলয়ে এ আন্দোলিত; আমি শোকার্ত হয়ে একে উচ্চারণ করেছি. এর নাম শ্লোক হোক।'

রামায়ণকার আদিকবির মুখ দিয়ে যে কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, সেটি কাব্যরসিক মানবমনের সাধারণ কৌতূহল। মহাকবিদের প্রতিভা এই যে অপূর্ব মনোহর শব্দগ্রন্থনের সৃষ্টি করে, 'কিমিদং'— এ কী বস্তু। এর স্বরূপ কী। তার উত্তরে যে আলোচনাব উৎপত্তি, আমাদের দেশের প্রাচীনেরা তার নাম দিয়েছেন অলংকারশাস্ত্র। সে শাস্ত্রের প্রধান কথা কাব্যজিজ্ঞাসা। কাব্যের কাব্যত্ব কোথায়। কোন্ গুণে বাক্য ও সন্দর্ভ কাব্য হয়। আলংকারিকদের ভাষায় কাব্যের আত্মা কী।

কাব্যের আত্মা যা-ই হোক, ওর শরীর হচ্ছে বাক্য— অর্থযুক্ত পদসমুচ্চয়। সুতরাং কাব্যদর্শনে যাঁরা দেহাত্মবাদী, তাঁরা বলেন, ঐ বাক্য অর্থাৎ শব্দ ও অর্থ ছাড়া কাব্যের আর স্বতন্ত্র আত্মা নেই। বাক্যের শব্দ আর অর্থকে আটপৌরে না রেখে সাজসজ্জায় সাজিয়ে দিলেই বাক্য কাব্য হয়ে ওঠে। এই সাজসজ্জার নাম অলংকার। শব্দকে অলংকারে, যেমন অনুপ্রাসে, সাজিয়ে সুন্দর করা যায়; অর্থকে উপমা, রূপক, উৎপ্রেক্ষা নানা অলংকারে চারুত্ব দান করা যায়। কাব্য যে মানুষের উপাদেয়, সে এই অলংকারের জন্য। 'কাব্যং গ্রাহ্যমলংকারাৎ।'[১] এ মতকে বালকোচিত ব'লে উড়িয়ে দেওয়া কিছু নয়। এই মত থেকেই কাব্যজিজ্ঞাসা শাস্ত্রের নাম হয়েছে অলংকারশাস্ত্র। এবং যেমন অধিকাংশ লোক মতে না হলেও জীবনে লোকায়ত মতের অনুবর্তী, দেহ ছাড়া যে মানুষের আর কিছু

১ বামন

আছে, তাদের জীবনযাত্রা তার কোনো প্রমাণ দেয় না, তেমনি মুখের মতামত ছেড়ে যদি অন্তরের কথা ধরা যায়, তবে দেখা যাবে, অধিকাংশ কাব্যপাঠক কাব্যবিচারে এই দেহাত্মবাদী। তাদের কাব্যের আস্বাদন শব্দ ও অর্থের অলংকারের আস্বাদন। এবং সেইজন্য অনেক লেখক, যাদের রচনা অলংকৃত বাক্য ছাড়া আর কিছু নয়, তারা পৃথিবীর সব দেশে কবি পদবী লাভ করেছে।

অলংকারবাদীদের সমালোচনায় অন্য আলংকারিকেরা বলেছেন, কাব্য যে অলংকৃত বাক্য নয়, তার প্রমাণ শব্দ ও অর্থ দু-রকম অলংকারই আছে অথচ বাক্যটি কাব্য নয়, এর বহু উদাহরণ দেওয়া যায় ; আবার সর্বসম্মতিতে যা অতি শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার কোনো অলংকার নেই, এরও উদাহরণ আছে। অর্থাৎ, সমালোচকদের ন্যায়ের ভাষায় কাব্যের ও-সংজ্ঞাটি অতিব্যাপ্তি ও অব্যাপ্তি দুই দোষেই দুষ্ট। যেমন 'সাহিত্যদর্পণ'-এর একজন টীকাকার উদাহরণ দিয়েছেন—

তরঙ্গনিকরোন্নীততরুণীগণসংকুলা।
সরিদ্বহতি কল্লোলবাহব্যাহততীরভূঃ॥

এ বাক্যের শব্দে ও অর্থে অনুপ্রাস ও রূপক -অলংকার রয়েছে, কিন্তু একে কেউ কাব্য বলবে না। বাক্য অনলংকৃত অথচ শ্রেষ্ঠ কাব্য, এর উদাহরণে সাহিত্যদর্পণকার কুমারসম্ভবের অকালবসন্তবর্ণনা থেকে তুলেছেন—

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥

এর এখানে-ওখানে যে একটু অনুপ্রাসের আমেজ আছে, তরঙ্গনিকরোন্নীত-তরুণীগণের কাছে তা দাঁড়াতেই পারে না, আর এর অর্থ একবারে নিরলংকার। অকালবসন্তের উদ্দীপনায় যৌবনরাগে রক্ত বনস্থলীতে রতিদ্বিতীয় মদনের সমাগমে তির্যকপ্রাণীদের অনুরাগের লীলাটি মাত্র কালিদাস ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাকে কোনো

অলংকারে সাজান নি। অথচ মনোহারিত্বে পাঠকের মনকে এ লুট করে নেয়। অলংকারবাদীরা বলবেন, এখানেও অলংকার রয়েছে—যার নাম স্বভাবোক্তি অলংকার। প্রতিপক্ষ উত্তরে বলবেন, ঐ নামেই প্রমাণ— অলংকার ছাড়াও কাব্য হয়। কারণ, যেখানে ক্রিয়া ও রূপের অকৃত্রিম বর্ণনাই কাব্য, সেখানে নেহাত মতের খাতিরে ছাড়া সেই বর্ণনাকেই আবার অলংকার বলা চলে না।

অলংকারবাদকে একটু শুধরে নিয়ে আর-এক দল আলংকারিক বলেন, অলংকৃত বাক্য-মাত্রেই যে কাব্য নয়, আর নিরলংকার বাক্যও কাব্য হতে পারে, তার কারণ, কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'রীতি'। 'রীতিরাত্মা কাব্যস্য।'[১] 'রীতি' হল পদরচনার বিশিষ্ট ভঙ্গি। বিশিষ্টা পদরচনা রীতিঃ।[২] অর্থাৎ, কাব্যের আত্মা হল 'স্টাইল'। স্টাইলের গুণেই বাক্য বা সন্দর্ভ কাব্য হয়, আর তার অভাবে বক্তব্য বিষয়ের সমতা থাকলেও অন্য বাক্য কাব্য হয় না। স্বীকার করতে হবে, পৃথিবীর অনেক কবির কাব্য এই গুণেই লোকরঞ্জক হয়েছে। ভারতচন্দ্রের প্রধান আকর্ষণ তাঁর স্টাইল। ইউরোপের অনেক আধুনিক পদ্য ও গদ্য -লেখক এই স্টাইলের গুণে বা নবীনত্বে আর্টিস্ট বা কবি নাম পেয়েছেন। অলংকার হচ্ছে এই স্টাইল বা রীতির আনুষঙ্গিক বস্তু। অঙ্গে অলংকার পরলেই মানুষকে সুন্দর দেখায় না, যদি না তার অবয়বসংস্থান নির্দোষ হয়। স্টাইল হচ্ছে কাব্যের সেই অবয়বসংস্থান।

রীতিবাদের দোষ দেখিয়ে অন্য আলংকারিকেরা বলেন, নির্দোষ অবয়বে ভূষণযোগ করলেই সৌন্দর্য আসে না, শরীরেও নয় কাব্যেও নয়।

প্রতীয়মানং পুনরন্যদেব বস্ত্বস্তি বাণীষু মহাকবীনাম্
যত্তৎপ্রসিদ্ধাবয়বাতিরিক্তং বিভাতি লাবণ্যমিবাঙ্গনাসু ॥[৩]

১ বামন, ২।৬ ২ বামন, ২।৭ ৩ ধ্বন্যালোক, ১।৪

'রমণীদেহের লাবণ্য যেমন অবয়বসংস্থানের অতিরিক্ত অন্য জিনিস, তেমনি মহাকবিদের বাণীতে এমন বস্তু আছে যা শব্দ, অর্থ, রচনাভঙ্গি, এ সবার অতিরিক্ত আরও কিছু।' এই 'অতিরিক্তবস্তু'ই কাব্যের আত্মা।

এ 'বস্তু' কী। উত্তরে বস্তুবাদী আলংকারিকেরা বলেন, এ জিনিসটি হচ্ছে কাব্যের বাচ্য বা বক্তব্য। "তরঙ্গনিকরোন্নীত" ইত্যাদি যে কাব্য নয়, তার কারণ, ওর বাচ্য কিছুই নয়, ওর বক্তব্য বিষয় অকিঞ্চিৎকর। অন্য বাক্যের মতো কাব্যও পদসমুচ্চয় দিয়ে, শব্দের সঙ্গে শব্দ সাজিয়ে, কোনো বস্তু বা ভাবকে প্রকাশ করে। কাব্যের কাব্যত্ব নির্ভর করে ঐ বস্তু বা ভাবের বিশিষ্টতার উপর। সব বস্তু কি সব ভাব কাব্যের বিষয় নয়। বিশেষ বিশেষ প্রকারের বস্তু ও বিশেষ বিশেষ রকমের ভাবকে প্রকাশ করলেই তবে বাক্য কাব্য হয়। যেমন, ভাব কি বস্তুর মনোহারিত্ব, চমৎকারিত্ব বা অভিনবত্ব বাক্যকে কাব্য করে। অনেক বস্তু আছে, যা স্বভাবতই মনোহারী—চন্দ্রচন্দনকোকিলালাপভ্রমরঝংকারাদয়ঃ। অনেক ভাব, যেমন, প্রেম, করুণা, বীর্য, মহত্ত্ব মনকে সহজেই আকৃষ্ট করে। কবিরা এইসব বিশিষ্ট ভাব ও বস্তুকে কাব্যে প্রকাশ করেন। এবং তাঁদের বিশিষ্ট পদরচনাভঙ্গি, শব্দ ও অর্থে যথোচিত অলংকারের সমাবেশ, তাঁদের বাচ্য ভাব ও বস্তুকে অধিকতর মনোজ্ঞ করে তোলে। ভাব, বস্তু, রীতি ও অলংকার, এদের যথাযথ সমবায়েই কাব্যের সৃষ্টি। এ-সবার অতিরিক্ত কাব্যের আত্মা ব'লে আর ধর্মান্তর নেই। যেমন বার্হস্পত্যেরা বলেছেন— রক্ত, মাংস, মজ্জা ইত্যাদি উপাদানের সংমিশ্রণেই মানবদেহে চেতনার আবির্ভাব হয়; মন নামে কোনো স্বতন্ত্র বস্তু নেই।

যে-সব আলংকারিক বস্তুবাদীদের মতে মত দিতে পারেন নি, তাঁদেরও স্বীকার করতে হয়েছে, অধিকাংশ কবির কাব্য এই ভাব,

বস্তু, রীতি ও অলংকারের গুণেই কাব্য। এমন কি মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধেরও অনেকাংশে এ ছাড়া আর কিছু নেই। তবে তাঁদের ভাব ও বস্তুর চমৎকারিত্ব হয়তো বেশি, তাঁদের রচনা ও প্রকাশভঙ্গি আরও বিচিত্র, তাঁদের অলংকার অধিকতর সংগত ও শোভন। কিন্তু তবুও যে এই আলংকারিকেরা কাব্যবিচারে এখানেই থামতে পারেন নি, তার কারণ, তাঁরা দেখেছেন, যা শ্রেষ্ঠ কাব্য, তার প্রকৃতিই হচ্ছে বাচ্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া। শব্দার্থমাত্রে যেটুকু প্রকাশ হয়, সেই কথাবস্তু কাব্যের প্রধান কথা নয়। তা যদি হত, তবে যার শব্দার্থের জ্ঞান আছে, তারই কাব্যের আস্বাদান হত, কিন্তু তা হয় না।

শব্দার্থশাসনজ্ঞানমাত্রেণৈব ন বেদ্যতে।
বেদ্যতে স হি কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞৈরেব কেবলম্।[1]

'কাব্যের যা সার অর্থ, কেবল শব্দার্থের জ্ঞানে তার জ্ঞান হয় না, একমাত্র কাব্যার্থতত্ত্বজ্ঞেরাই সে অর্থ জানতে পারেন।'

যদি চ বাচ্যরূপ এবাসাবর্থ স্যাৎ তদ্বাচ্য-বাচক-স্বরূপপরিজ্ঞানাদেব তৎপ্রতীতিঃ স্যাৎ।

'কাব্যার্থ যদি কেবল বাচ্যরূপ হত, তবে বাচ্যবাচকের স্বরূপজ্ঞানেই কাব্যার্থের প্রতীতি হত।'

অথ চ বাচ্যবাচকরূপলক্ষণকৃতশ্রমাণাং কাব্যতত্ত্বার্থভাবনাবিমুখানাং স্বরশ্রুত্যাদিলক্ষণমিব প্রগীতানাং গান্ধর্বলক্ষণবিদামগোচর এবাসাবর্থঃ।[2]

'অথচ দেখা যায়, কেবল বাচ্যবাচক লক্ষণের জ্ঞানলাভেই যারা শ্রম করেছে, কিন্তু বাচ্যাতিরিক্ত কাব্যতত্ত্বের আস্বাদনে বিমুখ, প্রকৃত কাব্যার্থ তাদের অগোচর থাকে; যেমন গানের লক্ষণমাত্র যারা জানে, তাদেরই সংগীতের সুর ও শ্রুতির অনুভূতি হয় না।' অর্থাৎ, শ্রেষ্ঠ কাব্য নিজের বাচ্যার্থে পরিসমাপ্ত না হয়ে বিষয়ান্তরে ব্যঞ্জনা করে। আলংকারিকেরা কাব্যের এই বাচ্যাতিরিক্ত ধর্মান্তরের অভিব্যঞ্জনার

১ ধ্বন্যালোক, ১।৭ ২ ধ্বন্যালোক, ১।৭, বৃত্তি

নাম দিয়েছেন 'ধ্বনি'।

যত্রার্থঃ শব্দো বা তমর্থমুপসর্জনীকৃতস্বার্থৌ।
ব্যঙ্ক্তঃ কাব্যবিশেষঃ স ধ্বনিরিতি সূরিভিঃ কথিতঃ॥[১]

'যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ ক'রে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই 'ধ্বনি' বলেছেন।' এই ব্যঞ্জিত অর্থের আলংকারিক পরিভাষা হল 'ব্যঙ্গ্য' বা 'ব্যঙ্গ্যার্থ'। ধ্বনিবাদীরা বলেন, এই 'ধ্বনি' বা 'ব্যঙ্গ্য' হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারতম বস্তু।

কিন্তু গোড়াতেই তাঁরা সাবধান করেছেন যে, কাব্যের 'ধ্বনি', উপমা ও অনুপ্রাস প্রভৃতি যে-সব অলংকার তার বাচ্যবাচকের— অর্থ ও শব্দের— চারুত্ব সম্পাদন করে, তাদের চেয়ে পৃথক জিনিস।

বাচ্যবাচকচারুত্বহেতুভ্য উপমাদিভোঽনুপ্রাসাদিভ্যশ্চ বিভক্ত এব।[২]

কারণ, শ্রেষ্ঠ কবিরা এমন সুকৌশলে এ-সব অলংকারের প্রয়োগ করেন যে, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, ঐ অলংকার বুঝি কবিতাকে বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে ধ্বনিতে নিয়ে গেল। কিন্তু কাব্যরসিকেরা জানেন, শ্রেষ্ঠ কাব্যের আত্মা যে 'ধ্বনি' তা সেখানে নেই। কারণ, সেখানেও বাচ্যই প্রধান; ধ্বনির আভাস যেটুকু আছে, তা বাচ্যার্থের অনুযায়ী-মাত্র। কিন্তু, শ্রেষ্ঠ কাব্যের যে 'ধ্বনি' তাই তার প্রধান বস্তু।

ব্যঙ্গ্যস্য যত্রাপ্রাধান্যং বাচ্যমাত্রানুযায়িনঃ।
সমাসোক্ত্যাদয়স্তত্র বাচ্যালংকৃতয়ঃ স্ফুটাঃ॥
ব্যঙ্গ্যস্য প্রতিভামাত্রে বাচ্যার্থানুগমেঽপি বা।
ন ধ্বনির্যত্র বা তস্য প্রাধান্যং ন প্রতীয়তে॥
তৎপরাবেব শব্দার্থৌ যত্র ব্যঙ্গ্যং প্রতি স্থিতৌ।
ধ্বনেঃ স এব বিষয়ো মন্তব্যঃ সংকরোজ্ঝিতঃ॥[৩]

'ব্যঙ্গ্য যেখানে অপ্রধান এবং বাচ্যার্থের অনুযায়ীমাত্র, যেমন

১ ধ্বন্যালোক, ১।১৩ ২ ধ্বন্যালোক, ১।১৩, বৃত্তি ৩ ধ্বন্যালোক, ১।১৪, ১৫, ১৬

সমাসোক্তিতে, সেখানে সেটি স্পষ্টই কেবল বাচ্যালংকার, ধ্বনি নয়। ব্যঙ্গ্য আভাসমাত্রে থাকলে, অথবা বাচ্যার্থের অনুগামী হলে তাকে ধ্বনি বলে না; কারণ, ধ্বনির প্রাধান্য সেখানে প্রতীয়মান নয়। যেখানে শব্দ ও অর্থ ব্যঙ্গ্যতেই প্রতিষ্ঠিত থাকে, সেই হচ্ছে ধ্বনির বিষয়; সুতরাং সংকরালংকার আর ধ্বনি এক নয়।'

এখানে যে দুটি অলংকারের বিশেষ করে নামোল্লেখ আছে, তার মধ্যে সমাসোক্তি অলংকারে বর্ণিত বস্তুতে অন্য বস্তুর ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু, ঐ ভিন্ন বস্তু বা তার ব্যবহারের স্বতন্ত্র উল্লেখ থাকে না; বর্ণিত বস্তুর কার্যবর্ণনা বা বিশেষণের মধ্যেই এমন ইঙ্গিত থাকে, যা তাদের সূচিত করে। এতে শব্দের প্রয়োগ খুব সংক্ষেপ হয় বলে এর নাম সমাসোক্তি। আনন্দবর্ধন খুব একটা জমকালো উদাহরণ তুলেছেন—

উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং তথা গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্।
যথা সমস্তং তিমিরাংশুকং তয়া পুরোঽপি রাগাদ্গলিতং ন লক্ষিতম্॥

'উপগত সন্ধ্যারাগে আকাশে যখন তারকা অস্থিরদর্শন, সেই নিশার প্রারম্ভে যেমন চন্দ্রোদয় হল, অমনি পূর্বদিকের সমস্ত তিমিরযবনিকা কখন যে রশ্মিরাগে অপসৃত হল তা লক্ষ্যই হল না।' এখানে রাত্রি ও চন্দ্রে, নায়িকা ও নায়কের ব্যবহার আরোপ করে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রচনায় শিল্পকৌশলের চাতুর্য যথেষ্ট। ওর প্রতি শব্দটি শ্লিষ্ট; রাত্রি ও চন্দ্রের কথাও বলছে, আবার নায়িকা ও নায়কের ব্যবহারও ইঙ্গিত করছে। উপোঢ়রাগেণ বিলোলতারকং— সন্ধ্যার অরুণিমায় আকাশের তারা অস্থিরদর্শন, আবার উপচিত অনুরাগে চঞ্চল চক্ষুতারকা। গৃহীতং শশিনা নিশামুখম্— চন্দ্রোদয়ে আভাসিত রাত্রির প্রারম্ভ আবার মুখ অর্থে বদন, গৃহীত মানে ধৃত, পরিচুম্বিত। সমস্তং তিমিরাংশুকং— এর ইঙ্গিত খুব স্পষ্ট; কিন্তু একটু কারিকুরি আছে। অংশুক মানে শুধু কাপড় নয়, সূক্ষ্ম বস্ত্র— যা

নায়িকোচিত, এবং সন্ধ্যার অন্ধকারও গাঢ় নয়— পাতলা অন্ধকার। পুরঃ— অর্থ পূর্বদিক, আবার সম্মুখে। রাগাদ্‌গলিতং— আলোকরাগে অপসৃত, আবার অনুরাগের আবেশে স্খলিত। ন লক্ষিতং— রাত্রির প্রারম্ভ লক্ষিত হল না, আবার অনুরাগের আবেশে অজ্ঞাতেই নীলাংশুক স্খলিত হল। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও আনন্দবর্ধন বলছেন— এখানে ধ্বনি নেই, কেননা এখানে বাচ্যই প্রধান, ব্যঙ্গ্যার্থ তার অনুগামী মাত্র— ইত্যাদৌ ব্যঙ্গ্যেনানুগতং বাচ্যমেব প্রাধান্যেন প্রতীয়তে। রাত্রি ও চন্দ্রে নায়িকানায়কের ব্যবহার সমারোপিত হয়েছে, এই বাক্যার্থ ছাড়িয়ে এ কবিতা আর বেশি দূর যায় নি— সমারোপিতনায়িকানায়ক ব্যবহারয়োর্নিশাশশিনোরেব বাচ্যার্থত্বাৎ। নায়কনায়িকা-ব্যবহারের যে ব্যঞ্জনা, সেটি বাচ্যার্থেরই বৈচিত্র্যসম্পাদকমাত্র।

দ্বিতীয় অলংকারটি হচ্ছে সংকরালংকার। ওর নাম সংকর; কারণ, ওতে একাধিক অলংকার মিশ্রিত থাকে। যেমন এক অলংকারের প্রয়োগ হয়, কিন্তু সেটি আবার অন্য একটি অলংকারকে সূচিত করে। লোচনকার অভিনবগুপ্ত কুমারসম্ভবের একটা বিখ্যাত শ্লোক উদাহরণ দিয়েছেন—

> প্রবাতনীলোৎপলনির্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা।
> তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ॥

'বায়ুকম্পিত নীলপদ্মের মতো সেই আয়তলোচনার চঞ্চল দৃষ্টি, সে কি হরিণীদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছে, না হরিণীরাই তার কাছে গ্রহণ করেছে, তা সংশয়ের কথা।' এখানে বক্তব্য হল— যৌবনারূঢ়া পার্বতীর দৃষ্টি হরিণীর দৃষ্টির মতো চঞ্চল। কিন্তু এই উপমাটি স্পষ্ট না ব'লে একটি সন্দেহ দিয়ে তাকে প্রকাশ করা হয়েছে। এ-রকম কবিকল্পিত সংশয়কে আলংকারিকেরা বলেন সন্দেহালংকার। সুতরাং এখানে বাচ্য হল সন্দেহালংকার, কিন্তু তার ব্যঞ্জনা হচ্ছে একটি উপমা। কিন্তু এ ব্যঞ্জনা 'ধ্বনি' নয়। কারণ, এ কবিতার যেটুকু

মাধুর্য, তা ঐ ব্যঞ্জিত উপমার মধ্যে নেই, ব্যক্ত সন্দেহের মধ্যেই রয়েছে। উপমাটি বরং ঐ সন্দেহের অভ্যুত্থানে সহায়তা ক'রে তার সঙ্গে একাঙ্গ হয়ে, সন্দেহেই পর্যবসিত হয়েছে।

> অত্র মৃগাঙ্গনাবলোকনেন তদবলোকনস্যোপমা যত্তপি ব্যঙ্গ্যা তথাপি বাচ্যস্য সা সন্দেহালংকারস্যাভ্যুত্থানকারিণীত্বেনাহুগ্রাহকত্বাদগুণীভূতা। অনুগ্রাহ্যত্বে তর্হি সন্দেহে পর্যবসানম্।[১]

অর্থাৎ, অভিনবগুপ্তের মতে মহাকবির এই বিখ্যাত কবিতাটি শ্রেষ্ঠ কাব্য নয়, বর্ণনাকৌশলে মনোহারী মাত্র।

সমাসোক্তি ও সন্দেহালংকারে যে ব্যঞ্জনা থাকে, সে ব্যঞ্জনা যে কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি' নয়, এ বিচারের উদ্দেশ্য এই প্রমাণ করা যে, বাক্যে যে-কোনো ব্যঞ্জনা থাকলেই তা কাব্য হয় না। বিশ্বনাথ অবশ্য সোজাসুজি বলেছেন তা হলে প্রহেলিকাও কাব্য হত। কিন্তু এই-সব অলংকার প্রযুক্ত হলে, তাদের কৌশল ও মাধুর্য তাদের ব্যঞ্জনাকে 'ধ্বনি' বলে ভ্রম জন্মাতে পারে, এইজন্য এদের সম্বন্ধেই বিশেষ করে সাবধান করা প্রয়োজন। সমাসোক্তিতে যে ব্যঞ্জনা, তা হচ্ছে এক বস্তুর বর্ণনা দিয়ে অন্য বস্তুর ব্যঞ্জনা। সংকরালংকারের ব্যঞ্জনা এক অলংকার দিয়ে অন্য অলংকারের ব্যঞ্জনা। সুতরাং যেখানে শব্দার্থ কেবলমাত্র বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, সে ব্যঞ্জনা শ্রেষ্ঠ কাব্যের 'ধ্বনি' বা ব্যঞ্জনা নয়। যে 'ধ্বনি' কাব্যের আত্মা, তার ব্যঞ্জনা কাব্যের বাচ্যার্থকে বস্তু ও অলংকারের অতীত এক ভিন্ন লোকে পৌঁছে দেয়।

কাব্য তার বাচ্যার্থকে ছাড়িয়ে যায়, মহাকবির কথা কথার অতীত লোকে পাঠককে নিয়ে যায়— এ-সব উক্তি যেমন একালের, তেমনি সেকালের বস্তুতান্ত্রিক লোকের কাছে হেঁয়ালি বলেই মনে হয়েছে। প্রাচীন বস্তুতান্ত্রিকেরা বলেছেন— কাব্যের বাচ্যও নয়, তার

১ অভিনবগুপ্ত

গুণঅলংকারও নয়, অথচ 'ধ্বনি' বলে অপূর্ব এক বস্তু, এ আবার কী। ও-জিনিস হয় কাব্যের শোভা, তার গুণ ও অলংকারের মধ্যেই আছে, নয়তো ও কিছুই নয়, একটা প্রবাদ মাত্র। খুব সম্ভব শব্দ ও অর্থের অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে প্রসিদ্ধ আলংকারিকেরা বর্ণনা করেন নি, এমন একটি বৈচিত্র্যকে একজন বলেছে 'ধ্বনি', আর অমনি একদল লোক অলীক সহৃদয়ত্বভাবনায় মুকুলিতচক্ষু হয়ে 'ধ্বনি' 'ধ্বনি' বলে নৃত্য আরম্ভ করেছে—

কিং চ বাগ্বিকল্পানামানন্ত্যাৎ সংভবত্যপি বা কস্মিংশ্চিৎ কাব্যলক্ষণবিধায়িভিঃ প্রসিদ্ধৈরপ্রদর্শিতে প্রকারলেশে ধ্বনির্ধ্বনিরিতি তদলীকসহৃদয়ত্বভাবনামুকুলিতলোচনৈর্নৃত্যতে।...তস্মাৎ প্রবাদমাত্রং ধ্বনিঃ।'[1]

ধ্বনিবাদের মুখ্যাচার্য আনন্দবর্ধন তাঁর ধ্বন্যালোক গ্রন্থে মনোরথ নামে এক সমসাময়িক কবির বাক্য তুলেছেন, যা নিশ্চয়ই একালের বস্তুতান্ত্রিকদের মনোরথ পূর্ণ করবে—

যস্মিন্নস্তি ন বস্তু কিঞ্চন মনঃপ্রহ্লাদি সালংকৃতি
ব্যুৎপন্নৈ রচিতং চ নৈব বচনৈর্বক্রোক্তিশূন্যং চ যৎ।
কাব্যং তদ্ধ্বনিনা সমন্বিতমিতি প্রীত্যা প্রশংসঞ্জড়ো
নো বিদ্মোঽভিদধাতি কিং সুমতিনা পৃষ্টঃ স্বরূপং ধ্বনেঃ॥

'যে কবিতায় সুষমাময় মনোরম বস্তু কিছু নেই, চতুর বচনবিন্যাসে যা রচিত নয় এবং অর্থ যার অলংকারহীন, জড়বুদ্ধি লোকেরা গতানুগতিকের প্রীতিতে (অর্থাৎ ফ্যাশানের খাতিরে) তাকেই ধ্বনিযুক্ত কাব্য ব'লে প্রশংসা করে। কিন্তু বুদ্ধিমান লোকের কাছে 'ধ্বনি'র স্বরূপ কেউ ব্যাখ্যা করেছে, এ তো জানা যায় না।'

এ সমালোচনায় ধ্বনিবাদীরা বিচলিত হন নি। তাঁরা স্বীকার করেছেন, কাব্যের 'ধ্বনি', তার বাচ্যার্থের মতো এত স্পষ্ট জিনিস নয় যে, ব্যাকরণ ও অভিধানে ব্যুৎপত্তি থাকলেই তার প্রতীতি

১ ধ্বন্যালোক, ১।১ বৃত্তি

হবে। কিন্তু তাঁরা বলেছেন, যার কিছুমাত্র কাব্যবোধ আছে, তাকেই হাতেকলমে কাজ ক'রে দেখানো যায় যে, কাব্যের আত্মা হচ্ছে 'ধ্বনি', বাচ্যাতিরিক্ত এক বিশেষ বস্তুর ব্যঞ্জনা। কারণ, বাচ্য বা বক্তব্য এক হলেও এই 'ধ্বনি'র অভাবে এক বাক্য কাব্য নয়, আর 'ধ্বনি' আছে ব'লে অন্য বাক্য শ্রেষ্ঠ কাব্য, এ সহজেই দেখানো যায়। ধ্বনিবাদীদের অনুসরণে দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যাক।

'বিবাহপ্রসঙ্গে বরের কথায় কুমারীরা লজ্জানতমুখী হলেও পুলকোদ্‌গমে তাদের অন্তরের স্পৃহা সূচিত হয়'— এই তথ্যটি নিম্নের শ্লোকে বলা হয়েছে—

কৃতে বরকথালাপে কুমার্যঃ পুলকোদ্গমৈঃ।
সূচয়ন্তি স্পৃহামন্তর্লজ্জয়াবনতাননাঃ॥

কোনো কাব্যরসিক এ শ্লোককে কাব্য বলবে না। ঠিক ঐ কথাই কালিদাস পার্বতীর সম্বন্ধে কুমারসম্ভবে বলেছেন, যেখানে নারদ মহাদেবের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব নিয়ে হিমালয়ের কাছে এসেছেন—

এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী।
লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্বতী॥

এর কাব্যত্ব সম্বন্ধে কেউ প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু কেন। কোথায় এর কাব্যত্ব। এর যা বাচ্যার্থ, তা তো পূর্বের শ্লোকের সঙ্গে এক। কোনো অলংকারের সুষমায় এ কাব্য নয়; কারণ কোনো অলংকারই এতে নেই। ধ্বনিবাদীরা বলেন, স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, এ কবিতার শব্দার্থ, লীলাকমলের পত্রগণনা— তার বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে অর্থান্তরের— পূর্বরাগের লজ্জাকে ব্যঞ্জনা করছে; এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব।

অত্র হি লীলাকমলপত্রগণনমুপসর্জনীকৃতস্বরূপং···অর্থান্তরং ব্যভিচারিভাবলক্ষণং প্রকাশয়তি।[১]

নারীর সৌন্দর্যের উপমান যে জল স্থল আকাশের সর্বত্র খুঁজতে

১ ধ্বন্যালোক, ২।২২, বৃত্তি

হয়, এ একটি অতিসাধারণ কবিপ্রসিদ্ধি। নিম্নের শ্লোকে সেই ভাবটি প্রকাশ করা হয়েছে।

শশিবদনাসিতসরসিজনয়না সিতকুন্দদশনপংক্তিরিয়ম্।
গগনজলস্থলসংভবহৃদ্যাকারা কৃতা বিধিনা॥

'আকাশের চন্দ্রের মতো মুখ, নীলপদ্মের মতো চক্ষু, শুভ্র কুন্দফুলের মতো দশনপংক্তি— গগনে জলে স্থলে হৃদ্য যা-কিছু আছে, তার আকার দিয়ে বিধাতা তাকে নির্মাণ করেছেন।' এ কবিতাকে কাব্য বলা চলে কি না, সে সংশয় স্বাভাবিক। কিন্তু ঐ কবিপ্রসিদ্ধিকেই আশ্রয় ক'রে কালিদাস যখন প্রবাসী যক্ষকে দিয়ে বলিয়েছেন—

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
গণ্ডচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে ভীরু সাদৃশ্যমস্তি॥

তখন তাতে কাব্যত্ব এল কোথা থেকে। ধ্বনিবাদীরা বলেন, অলংকারগুলি তাদের অলংকারত্বের সীমা ছাড়িয়ে প্রবাসীর বিরহব্যথাকে ব্যঞ্জনা করছে বলেই এ কবিতা শ্রেষ্ঠ কাব্য। এর বাচ্য কতকগুলি উপমা, কিন্তু এর 'ধ্বনি' প্রিয়াবিরহীর অন্তর-ব্যথা। এবং সেখানেই এর কাব্যত্ব।

মদনের দেহ ভস্ম হয়েছে, কিন্তু তার প্রভাব সমস্ত বিশ্বময়—এই ভাব নিম্নের কবিতাদুটিতে বলা হয়েছে।

স একস্ত্রীণি জয়তি জগন্তি কুসুমায়ুধঃ
হরতাপি তনুং যস্য শম্ভুনা ন হৃতং বলম্॥

'সেই এক কুসুমায়ুধ তিন লোক জয় করে। শম্ভু তার দেহ হরণ করেছেন, কিন্তু বল হরণ করতে পারেন নি।'

কর্পূর ইব দগ্ধোঽপি শক্তিমান্ যো জনে জনে।
নমোঽস্ত্ববার্যবীর্যায় তস্মৈ কুসুমধন্বনে॥

'দগ্ধ হলেও কর্পূরের মতো প্রতিজনকে তার গুণ জানাচ্ছে; অবার্যবীর্য সেই কুসুমধনু মদনকে নমস্কার।'

অভিনবগুপ্ত বলেছেন (১।১৩)— এ কবিতাদুটিতে বাচ্যাতিরিক্ত ব্যঞ্জনা না থাকায় এরা কাব্য নয়। প্রথম কবিতাটি এই ভাব মাত্র প্রকাশ করেই শেষ হয়েছে যে, মদনের শক্তির কারণ অচিন্ত্য— ইয়ং চাচিন্ত্যনিমিত্তেতি নাস্যাং ব্যঙ্গ্যস্য সম্ভাবঃ। দ্বিতীয়টি কর্পূরের স্বভাবের সঙ্গে মদনের স্বভাবের তুলনাতেই পর্যবসিত হয়েছে— বস্তু-স্বভাবমাত্রে তু পর্যবসানমিতি তত্রাপি ন ব্যঙ্গ্যসম্ভাবশঙ্কা। কিন্তু ঠিক এই কথাই রবীন্দ্রনাথের 'মদনভস্মের পরে' কবিতায় কাব্য হয়ে উঠেছে—

পঞ্চশরে দগ্ধ ক'রে করেছ এ কী সন্ন্যাসী!
বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে
ব্যাকুলতর বেদনা তার বাতাসে ওঠে নিশ্বাসি
অশ্রু তার আকাশে পড়ে গড়ায়ে।

অভিনবগুপ্ত নিশ্চয় বলতেন, তার কারণ এ কবিতার কথা তার বাচ্যকে ছাড়িয়ে, মানব-মনের যে চিরন্তন বিরহ, যা মিলনের মধ্যেও লুকিয়ে থাকে, তারই ব্যঞ্জনা করছে। এবং সেইখানেই এর কাব্যত্ব। অভিনব-গুপ্ত অবশ্য ঠিক এ ভাষা ব্যবহার করতেন না, কিন্তু ঐ একই কথা তিনি তাঁর আলংকারিকের ভাষায় বলতেন যে, এ কবিতার কাব্যত্ব হচ্ছে এর 'করুণ বিপ্রলম্ভের ধ্বনি'।

এই যে তিনটি উদাহরণেই দেখা গেল, কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয়, 'ব্যঞ্জনা', কথা নয় 'ধ্বনি'— এ ব্যঞ্জনা কিসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কিসের ধ্বনি। ধ্বনিবাদীদের উত্তর—'রস'-এর। তাঁরা দেখিয়ে-ছেন, বাক্য যদি মাত্র কেবল বস্তু বা অলংকারের ব্যঞ্জনা করে, তবে তা কাব্য হয় না। রসের ব্যঞ্জনাই বাক্যকে কাব্য করে। কাব্যের 'ধ্বনি' হচ্ছে রসের ধ্বনি। তিনটি উদাহরণেই কবিতার বাচ্য রসের

ব্যঞ্জনা করছে বলেই তা কাব্য। এই রসের যোগেই পরিচিত সাধারণ কথা নবীনত্ব লাভ করে কাব্যে পরিণত হয়েছে।—

দৃষ্টপূর্বা অপি হ্যর্থাঃ কাব্যে রসপরিগ্রহাৎ।
সর্বে নবা ইবাভান্তি মধুমাস ইব দ্রুমাঃ ॥[১]

'পূর্বপরিচিত অর্থও রসের যোগে কাব্যত্ব লাভ ক'রে বসন্তের নব-কিশলয়খচিত বৃক্ষের মতো নূতন ব'লে প্রতীয়মান হয়।' অর্থাৎ কাব্যের আত্মা 'ধ্বনি' ব'লে যাঁরা আরম্ভ করেছেন, কাব্যের আত্মা 'রস' বলে তাঁরা উপসংহার করেছেন। বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্।[২] কাব্য হচ্ছে সেই বাক্য, 'রস' যার আত্মা।

কোঽয়ং রসঃ। এ 'রস' জিনিসটি আবার কী।

পাঠকেরা যদি ইতিমধ্যেই নিতান্ত বিরস না হয়ে থাকেন, তবে পরের প্রস্তাবে প্রাচীন আলংকারিকদের রসবিচারের পরিচয় পাবেন। লেখকের মতে কাব্য সম্বন্ধে তার চেয়ে খাঁটি কথা কোনো দেশে, কোনো কালে, আর কেউ বলে নি।

১ ধ্বন্যালোক, ৪।৪ ২ সাহিত্যদর্পণ

রস

রবীন্দ্রনাথের 'কঙ্কাল' নামে গল্পের অশরীরী নায়িকাটি তার জীবিতকালের শরীরাবশেষ কঙ্কালটিকে নিয়ে বড়োই লজ্জায় পড়েছিল। অস্থিবিদ্যার্থী ছাত্রকে সে কী ক'রে বোঝাবে যে, ঐ কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখণ্ডের উপর তার ছাব্বিশ বৎসরের যৌবন "এত লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিনকোমল নিটোল পরিপূর্ণতা" নিয়ে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল যে, সে-শরীর থেকে যে অস্থিবিদ্যা শেখা যেতে পারে, তা অতিবড়ো শরীরবিদ্যাবিদেরও বিশ্বাস হত না। কাব্যের রসাত্মা যদি কাব্যরসের তত্ত্বালোচনা প্রত্যক্ষ করতেন, তবে তাঁকেও নিশ্চয় এমনি লজ্জা পেতে হত। কারণ, কাব্যের তত্ত্ববিচার কাব্যের কঙ্কাল নিয়েই নাড়াচাড়া। রসতত্ত্ব রস নয়, তত্ত্ব মাত্র। ধর্মপিপাসুর কাছে 'থিয়লজি' যে বস্তু, কাব্যরসিকের কাছে কাব্যের রসবিচারও সেই জিনিস। তবুও এ বিচারের দায় থেকে মানুষের নিষ্কৃতি নেই। যা মুখ্যতঃ বুদ্ধির বিষয় নয়, তাকেও বুদ্ধির কোঠায় এনে বুদ্ধির যন্ত্রপাতি দিয়ে একবার মাপজোখ ক'রে না দেখলে, মানুষের মনের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না। সুতরাং ধর্মের সঙ্গে 'থিয়লজি' থাকবেই, কাব্যের সঙ্গে সঙ্গে অলংকারশাস্ত্র গড়ে উঠবেই। কেবল ও-শাস্ত্রের লক্ষ্য ও প্রকৃতি সম্বন্ধে ভুল ধারণা থাকলেই বিপদ।

কাব্যের রসবিচার মানুষকে কাব্যরসের আস্বাদ দেয় না। সে আস্বাদ দরদী লোকের মন দিয়ে অনুভূতির জিনিস। আলংকারিকদের ভাষায় সে রস হচ্ছে 'সহৃদয়হৃদয়সংবাদী'। তত্ত্বের পথে আর একটু এগিয়ে গিয়ে আলংকারিকেরা বলেন কাব্যরসাস্বাদী সহৃদয় লোকের মনের বাইরে রসের আর কোনো স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই। অর্থাৎ, ঐ আস্বাদই হচ্ছে রস। যখন বলা হয় 'রসের আস্বাদ', তখন রস ও স্বাদের মধ্যে একটা কাল্পনিক ভেদ অঙ্গীকার করে কথা বলা হয়।[1]

১ রসঃ স্বাদ্যতে ইতি কাল্পনিকং ভেদমুরীকৃত্য কর্মকর্তরি বা প্রয়োগঃ।— সাহিত্যদর্পণ

যেমন আমরা কথায় বলি 'ভাত পাক হচ্ছে', যদিও পাকের যা ফল, তাই ভাত। তেমনি, যদিও কথায় বলি 'রসের প্রতীতি বা অনুভূতি', কিন্তু ঐ প্রতীতি বা অনুভূতিই হচ্ছে রস। সহৃদয় লোকের অর্থাৎ কাব্যানুশীলনের অভ্যাসবশে যাদের দর্পণের মতো নির্মল মন কাব্যের বর্ণনীয় বস্তুর যেন তন্ময়তা প্রাপ্ত হয়,[২] এমন দরদী লোকের সুকাব্যজনিত চিত্তের অনুভূতিবিশেষের নামই 'রস'। সুতরাং বলা যেতে পারে, কাব্যরসের আধার কাব্যও নয়, কবিও নয়— সহৃদয় কাব্যপাঠকের মন।

কাব্যে রসয়িতা সর্বো ন বোদ্ধা ন নিয়োগভাক্।

রস যখন এক রকমের মানসিক অবস্থা, তখন স্বভাবতই তার পরিচয়ের প্রথম কথা— কী করে মনে এ অবস্থার উদয় হয়। মানুষের জ্ঞানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ করে কাণ্ট দেখিয়েছেন যে, তাতে দু-রকমের উপাদান— মানসিক ও বাহ্যিক। বাইরের উপাদান ইন্দ্রিয়ের পথে মনে প্রবেশ করে, কিন্তু তা জ্ঞান নয়। জ্ঞানের তখনই উদয় হয়, যখন মনের কতকগুলি তত্ত্ব ঐ বাহ্যিক উপাদানের উপর ক্রিয়া ক'রে তাকে এক বিশেষ পরিণতি ও আকার দান করে। এইসব তত্ত্ব মন বাইরে থেকে পায় না, নিজের ভিতর থেকে এনে বাইরের জিনিসের উপর ছাপ দেয়। রৌদ্রের তাপে যে মাথা গরম হয়, এ জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদান রৌদ্র এবং পূর্বের ঠাণ্ডা ও পশ্চাৎ গরম মাথা— ইন্দ্রিয়ের পথ দিয়েই মনে আসে; কিন্তু রৌদ্র ও গরম মাথার সম্বন্ধটি, অর্থাৎ ওদের কার্যকারণসম্বন্ধ মনের নিজের দান। এই কার্যকারণতত্ত্বের প্রয়োগেই ঐ বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানে পরিণত হয়েছে। অথবা, উলটো

১ ওদনং পচতীতিবদ্ব্যবহারঃ প্রতীয়মান এব হি রসঃ। —অভিনবগুপ্ত, ২।৪

২ যেষাং কাব্যানুশীলনাভ্যাসবশাদ্বিশদীভূতে মনোমুকুরে বর্ণনীয়তন্ময়ীভবনযোগ্যতা তে হৃদয়সংবাদভাজঃ সহৃদয়াঃ।— অভিনবগুপ্ত, ১।১

বলাও চলে, ঐ বাহ্যিক উপাদানই মনোগত সাধারণ কার্যকারণতত্ত্বকে বিশেষ কার্যকারণের জ্ঞানে পরিণত করে। এবং জ্ঞান অর্থই বিশেষ জ্ঞান। বাহ্যিক উপাদান ও মানসিক তত্ত্ব, এ দুয়ের সংযোগ হলে তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এর দ্বিতীয়টি ছাড়া প্রথমটি অন্ধ, ও প্রথমটি ছাড়া দ্বিতীয়টি কেবল পঙ্গু নয়, একেবারে শূন্য।

রসের বিশ্লেষণে আলংকারিকেরাও এই দু-উপাদান পেয়েছেন—মানসিক ও বাহ্যিক। রসের মানসিক উপাদান হল মনের 'ভাব' নামে চিত্তবৃত্তি বা 'ইমোশন'-গুলি। আর ওর বাহ্যিক উপাদান জ্ঞানের বাহ্যিক উপাদানের মতো, বাইরের লৌকিক জগৎ থেকে আসে না, আসে কবির সৃষ্টি কাব্যের জগৎ থেকে। আলংকারিকেরা বলেন, কাব্যজগতের ঐ বাহ্যিক উপাদানের ক্রিয়ায় মনের 'ভাব' রূপান্তরিত হয়ে রসে পরিণত হয়। সুতরাং আলংকারিকদের মতে রস জিনিসটি লৌকিক বস্তু নয়। মনের যে-সব 'ভাব' রসে রূপান্তরিত হয়, তারা অবশ্য লৌকিক। লৌকিক ঘরকন্নার জগতেই তাদের অস্তিত্ব, এবং সেই জগতের সঙ্গেই তাদের কারবার। কিন্তু এই 'ভাব' বা 'ইমোশন' 'রস' নয়, এবং মানুষের মনে যাতে এই 'ভাব' জাগিয়ে তোলে, তাও কাব্য নয়। 'শোক' একটি মানসিক 'ভাব' বা 'ইমোশন'। লৌকিক জগতের বাহ্যিক কারণে মনে শোক জেগে মানুষ শোকার্ত হয়। কিন্তু শোকার্ত লোকের মনের 'শোক' তার কাছে 'রস' নয়, এবং সে শোকের কারণটিও কাব্য নয়। কবি যখন তাঁর প্রতিভার মায়াবলে এই লৌকিক শোক ও তার লৌকিক কারণের এক অলৌকিক চিত্র কাব্যে ফুটিয়ে তোলেন, তখনি পাঠকের মনে রসের উদয় হয়, যার নাম 'করুণ রস'। এই করুণ রস শোকের 'ইমোশন' নয়। শোক হচ্ছে দুঃখদায়ক, কিন্তু কবির কাব্যে মনে যে করুণ রসের সঞ্চার হয়, তা চোখে জল আনলেও, মনকে অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ করে। এ কথা কাব্যের আস্বাদ যার আছে, সেই জানে। যদিও প্রমাণ করে

দেখানো কঠিন। কারণ—

> করুণাদাবপি রসে জায়তে যৎ পরং সুখম্।
> সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্ ॥[1]

'করুণ প্রভৃতি রসে যে মনে অপূর্ব সুখ জন্মে, তার একমাত্র প্রমাণ হৃদয়বান্ লোকের নিজের চিত্তের অনুভূতি।' তবু এ কথাও আলংকারিকেরা মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, করুণ রস যদি দুঃখেরই কারণ হত তবে রামায়ণ প্রভৃতি করুণরসের কাব্যের দিকেও কেউ যেত না।

> কিঞ্চ তেষু যদা দুঃখং ন কোঽপি স্যাত্তদুন্মুখঃ।
> তথা রামায়ণাদীনাং ভবিতা দুঃখহেতুতা ॥[1]

কিন্তু করুণরসের আনন্দ কাব্যরসিক মানুষকে নিয়তই সেদিকে টানছে। Our sweetest songs are those that tell of saddest thought. আলংকারিকেরা বলবেন, 'ঠিক কথা। কিন্তু মনে থাকে যেন, *tell* of saddest thought. যে বাস্তব ঘটনা মনে সোজাসুজি sad thought আনে, তা sweetও নয়, songও নয়। কবি যখন কাব্যে saddest thought-এর কথা বলেন, তখনি তা sweetest song হয়।'

ভাব ও রসের, বস্তুজগৎ ও কাব্যজগতের এই ভেদকে সুস্পষ্ট প্রকাশের জন্য আলংকারিকেরা বলেন, রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। ব্যবহারিক জগতের শোক, হর্ষ প্রভৃতির নানা লৌকিক কারণ মানুষের মনে শোক, হর্ষ প্রভৃতি লৌকিক ভাবের জন্ম দেয়। এর কোনোটি সুখের, কোনোটি দুঃখময়। কিন্তু ঐ-সকল লৌকিক ভাব, ও তাদের লৌকিক কারণ, কাব্যের জগতে এক অলৌকিক রূপ প্রাপ্ত হয়ে পাঠকের মনে ঐ-সব লৌকিক ভাবের যে বৃত্তি বা 'বাসনা' আছে, তাদের এক অলৌকিক বস্তু—'রস'-এ—

[1] সাহিত্যদর্পণ

পরিণত করে। রসের মানসিক উপাদান যে 'ভাব' তা দুঃখময় হলেও তার পরিণাম যে 'রস', তা নিত্য আনন্দের হেতু। কারণ, লৌকিক দুঃখের অলৌকিক পরিণতি আনন্দময় হওয়া কিছুই আশ্চর্য নয়।

হেতুত্বং শোকহর্ষাদে-
গতেভ্যো লোকসংশ্রয়াৎ।
শোকহর্ষাদয়ো লোকে
জায়ন্তাং নাম লৌকিকাঃ॥
অলৌকিকবিভাবত্বং
প্রাপ্তেভ্যঃ কাব্যসংশ্রয়াৎ।
সুখং সঞ্জায়তে তেভ্যঃ
সর্বেভ্যোঽপীতি কা ক্ষতিঃ॥[১]

২

কবি যে কাব্যের মায়াজগৎ সৃষ্টি করেন, তার কৌশলটি কী। এ প্রশ্নের যথার্থ উত্তর অবশ্য অসম্ভব। কারণ, এ প্রশ্ন হচ্ছে নিখিল কবিপ্রতিভার নিঃশেষ পরিচয় দাবি করা। কিন্তু প্রতি কবির প্রত্যেক কাব্যের নির্মাণকৌশল অন্য-সকল কাব্য থেকে অল্প-বিস্তর স্বতন্ত্র। কারণ, প্রত্যেক কাব্য একটি বিশেষ সৃষ্টি, কলের তৈরি জিনিস নয়। সুতরাং কাব্যতত্ত্ব সে কৌশলের যে পরিচয় দিতে পারে, সে পরিচয় সকলকাব্যসাধারণ কাব্যকৌশলের কঙ্কালমাত্রের পরিচয়। এ কাজ সম্ভব ; কারণ, দেহের রূপের ভেদ সত্ত্বেও, কঙ্কালের রূপ প্রায় এক।

আলংকারিকেরা বলেন, কাব্যনির্মাণকৌশলের তিন ভাগ। বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারী।

'বিভাব' কী।—

রত্যাদ্যুদ্বোধকা লোকে
বিভাবাঃ কাব্যনাট্যয়োঃ।[১]

১ সাহিত্যদর্পণ

'লৌকিক জগতে যা রতি প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধক, কাব্যে বা নাটকে তাকেই 'বিভাব' বলে।' যেমন—

যে হি লোকে রামাদিগত-রতি-হাসাদীনামুদ্বোধকারণানি সীতাদয়স্ত এব কাব্যে নাট্যে চ নিবেশিতাঃ সন্তো 'বিভাব্যন্তে আস্বাদাঙ্কুরপ্রাদুর্ভাব-যোগ্যাঃ ক্রিয়ন্তে সামাজিকরত্যাদি-ভাবাঃ' এভিঃ ইতি বিভাবা উচ্যন্তে।[১]

'লৌকিক জগতে যে সীতা ও তার রূপ, গুণ, চেষ্টা রামের মনে রতি, হর্ষ প্রভৃতি ভাবের উদ্‌বোধের কারণ, তাই যখন কাব্য ও নাট্যে নিবেশিত হয়, তখন তাকে বিভাব বলে। কারণ, তারা পাঠক ও সামাজিকের মনের রত্যাদি ভাবকে এমন পরিণতি দান করে যে, তা থেকে আস্বাদের অঙ্কুর নির্গত হয়।'

অনুভব বলে কাকে।—

উদ্বুদ্ধং কারণৈঃ স্বৈঃ স্বৈ-
বহির্ভাবং প্রকাশয়ন্।
লোকে যঃ কার্যরূপঃ সোঽ-
নুভাবঃ কাব্যনাট্যয়োঃ॥[১]

'মনে ভাব উদ্‌বুদ্ধ হলে, যে-সব স্বাভাবিক বিকার ও উপায়ে তা বাইরে প্রকাশ হয়, ভাবরূপ কারণের সেই-সব লৌকিক কার্য কাব্য ও নাটকের অনুভাব।'

দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্র নেত্রপাতে
স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
স্তব্ধ অর্ধরাতে।

"মিলন-মধুর লাজে"র এই কাব্য-ছবিটির উপাদান হচ্ছে কয়েকটি অনুভাব।

১ সাহিত্যদর্পণ

৩

এইখানে আচার্য অভিনবগুপ্ত যে এক দীর্ঘ সমাসবাক্যে কাব্যরসের সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। বিনা ব্যাখ্যাতেই এখন তার অর্থবোধ হবে।

শব্দসমর্প্যমাণহৃদয়সংবাদসুন্দরবিভাবানুভাবসমুদিত-প্রাঙ্ নিবিষ্টরত্যাদি-
বাসনানুরাগসুকুমার-স্বসংবিদানন্দচর্বণব্যাপার-রসনীয়-রূপো রসঃ।[১]

'রস হচ্ছে নিজের আনন্দময় সম্বিতের (consciousness) আস্বাদরূপ একটি ব্যাপার। মনের পূর্ব-নিবিষ্ট রতি প্রভৃতি ভাবের বাসনা দ্বারা অনুরঞ্জিত হয়েই সম্বিৎ আনন্দময় সৌকুমার্য প্রাপ্ত হয়। লৌকিক 'ভাব'-এর কারণ ও কার্য, কবির গ্রথিত শব্দে সমর্পিত হয়ে, সকল হৃদয়ে সমবাদী যে মনোরম বিভাব ও অনুভাব রূপ প্রাপ্ত হয়, সেই বিভাব ও অনুভাবই কাব্য-পাঠকের অন্তর্নিবিষ্ট ভাবগুলিকে উদ্‌বুদ্ধ করে।'

অভিনবগুপ্ত বিভাব ও অনুভাবকে বলেছেন— 'সকল হৃদয়ে সমবাদী।' কারণ, যে লৌকিক ভাবের তারা রসমূর্তি, সে লৌকিক ভাব ব্যক্তির হৃদয়ে আবদ্ধ, তা সামাজিক নয়।

পারিমিত্যাল্লৌকিকত্বাৎ
সান্তরায়তয়া তথা।
অনুকার্যস্থ রত্যাদে-
রুদ্‌বোধো ন রসো ভবেৎ॥[১]

'প্রেমিকের মনে যে প্রেমের উদ্‌বোধ, তা রস নয়। কারণ, তা প্রেমিকের নিজ হৃদয়ে আবদ্ধ, সুতরাং পরিমিত; তা লৌকিক, সুতরাং প্রেমের রসবোধের অন্তরায়।' কবি তাঁর প্রতিভার মায়ায় এই পরিমিত, লৌকিক ভাবকে "সকলসহৃদয়হৃদয়সংবাদী" অলৌকিক রসমূর্তিতে রূপান্তর করেন। কাব্যের বিভাব ও অনুভাবের মধ্যে এমন

১ অভিনবগুপ্ত ১।৪

একটি ব্যাপার আছে, যাতে কাব্যচিত্রিত চরিত্র বা ভাব এবং পাঠকের মধ্যে একটি সাধারণ সম্বন্ধের সৃষ্টি হয়—

ব্যাপারোঽস্তি বিভাবাদের্নাম্না সাধারণী কৃতিঃ।[১]

যার ফলে—

পরস্য ন পরস্যেতি
মমেতি ন মমেতি চ।
তদাস্বাদে বিভাবাদেঃ
পরিচ্ছেদো ন বিদ্যতে॥[১]

'কাব্য-পাঠকের মনে হয়, কাব্যের চরিত্র ও ভাব পরের, কিন্তু সম্পূর্ণ পরের নয়; আমার নিজের, কিন্তু সম্পূর্ণ নিজেরও নয়। এমনি করেই কাব্যের আস্বাদ কোনো ব্যক্তিত্বের পরিচ্ছেদে পরিচ্ছিন্ন থাকে না।'

কাব্যের সৃষ্টি যে সকল হৃদয়ে সম-বাদী, তার অর্থ এ নয় যে, বিজ্ঞানের জ্ঞানের মতো, তা একটি abstract জিনিস। কবি যে ভাব বা চরিত্র আঁকেন, তা বর্ণরূপহীন outline নয়, সম্পূর্ণ concrete ভাব বা চরিত্র। কিন্তু তার মধ্যেই নিখিল সহৃদয় জন নিজেকে প্রতিফলিত দেখে। অর্থাৎ, কাব্যের সৃষ্টি concrete universal-এর সৃষ্টি।

এইজন্যই কবি যখন কাব্যের ভাবকে রসের মূর্তিতে রূপান্তর করেন, তখন তিনি ভাবের লৌকিক পরিমিতত্বকে ছাড়িয়ে ওঠেন। লৌকিক ভাবের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ ও অভিভূত থাকলে, যেমন কাব্যরসের আস্বাদ হয় না, তেমনি কাব্যরসের সৃষ্টিও হয় না। ধ্বন্যালোকের একটি কারিকা আছে—

কাব্যস্যাত্মা স এবার্থস্তথা চাদিকবেঃ পুরা।
ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ববিয়োগোত্থঃ শোকঃ শ্লোকত্বমাগতঃ॥ ১।৫

১ সাহিত্যদর্পণ

'সেই রসই হচ্ছে কাব্যের আত্মা। যেমন, পুরাতনী কথায় বলে, আদি-কবির ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব-বিয়োগজনিত শোকই শ্লোকরূপে পরিণত হয়েছিল।'

কারিকাটিতে রঘুবংশের একটি শ্লোকের কাব্যকে তত্ত্বের রূপ দেওয়া হয়েছে।[১] এই কারিকার প্রসঙ্গে অভিনবগুপ্ত লিখেছেন— 'এ কথা মানতেই হবে যে, এ শোক মুনির নিজের শোক নয়। যদি তা হত, তবে ক্রৌঞ্চের শোকে মুনি দুঃখিত হয়েই থাকতেন, করুণ রসের শ্লোক রচনার তাঁর অবকাশ হত না। কারণ, কেবল দুঃখসন্তপ্তের কাব্য রচনা কখনও দেখা যায় না।'

ন তু মুনেঃ শোক ইতি মন্তব্যম্। এবং হি সতি তদ্দুঃখেন সোঽপি দুঃখিত ইতি কৃত্বা রসস্যাত্মতেতি নিরবকাশং ভবেৎ। ন তু দুঃখসংতপ্তস্যৈষা দশেতি।

অভিনবগুপ্ত বলেন, এখানে যা ঘটেছে, তা এই— 'সহচরী-বিয়োগ-কাতর ক্রৌঞ্চের শোক মুনির মনে, লৌকিক শোক থেকে বিভিন্ন, নিজের চিত্ত-বৃত্তির আস্বাদনস্বরূপ করুণ রসের রূপ প্রাপ্ত হয়েছে। এবং যেমন পরিপূর্ণ কুম্ভ থেকে জল উচ্ছলিত হয়ে পড়ে, তেমনি ক'রে ঐ রস মুনির মন থেকে ছন্দোবৃত্তি-নিয়ন্ত্রিত শ্লোকরূপে নির্গত হয়েছে।'

সহচরীহননোদ্ভূতেন সাহচর্যধ্বংসনেনোত্থিতো যঃ শোকঃ…স এব…… আস্বাদ্যমানতাং প্রতিপন্নঃ করুণরসরূপতাং লৌকিকশোকব্যতিরিক্তাং স্বচিত্তবৃত্তিসমাস্বাদ্যসারাং প্রতিপন্নো রসঃ পরিপূর্ণকুম্ভোচ্ছলনবং…… সমুচিতছন্দোবৃত্তাদিনিয়ন্ত্রিতশ্লোকরূপতাং প্রাপ্তঃ।

আলংকারিকদের আবিষ্কৃত লৌকিক ভাবকে কাব্যের রসে রূপান্তরের এই তত্ত্বটি ইতালীয়ান দার্শনিক বেনেডেটো ক্রোচ অনেকটা ধরেছেন। তাঁর 'কাব্য ও অকাব্য' নামক গ্রন্থে ক্রোচ লিখছেন—

১ নিষাদবিদ্ধাণ্ডজদর্শনোত্থঃ
শ্লোকত্বমাপদ্যত যস্য শোকঃ।—রঘুবংশ, ১৪।৭০

> **What should we call the blindness of a poet? The incapacity of seeing particular passions in the light of human passion, aspirations in the fundamental and total aspiration, partial and discordant ideals in the ideal which shall compose them in harmony: what at one time was called incapacity of 'idealizing'. For poetic idealization is not a frivolous embellishment, but a profound penetration, in virtue of which we pass from troublous emotion to the serenity of contemplation. He who fails to accomplish this passage, but remains immersed in passionate agitation, never succeeds in bestowing pure poetic joy either upon others or upon himself, whatever may be his efforts.**[১]

ক্রোচের "poetic idealization" আলংকারিকদের 'ভাব' ও তার কারণ কার্যের, "সকলহৃদয়সংবাদী" বিভাব, অনুভাবে পরিণতি। ক্রোচের "passage from troublous emotion to the serenity of contemplation", আলংকারিকদের লৌকিক ভাবকে আস্বাদ্যমান রসে রূপান্তর। "Serenity of contemplation" হচ্ছে দার্শনিকসুলভ মননবৃত্তির উপর ঝোঁক দিয়ে কথা বলা। আলংকারিকদের 'রসচর্বণ' কথাটি মূল সত্যকে অনেক বেশি ফুটিয়ে তুলেছে।

কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ যে কাব্যতত্ত্বের ব্যাখ্যায় বলেছিলেন, poetry "takes its origin from emotion recollected in tranquillity", সেটি আলংকারিকদের এই 'রূপান্তরবাদে'রই অস্পষ্ট অনুভূতি ও অস্ফুট বিবৃতি।

আজকের দিনের লিরিক কাব্যের যুগে, যখন কবির নিজের মনের ভাবই কাব্যের উপাদান, তখন এ ভ্রম সহজেই হয় যে,

১ *European Literature in the Nineteenth Century* নামে ইংরাজি অনুবাদ, ৫২ পৃষ্ঠা।

কবির হৃদয়ের ভাবকে পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করাই বুঝি কাব্যের লক্ষ্য। এবং যে কবির হৃদয়ের ভাব যত তীব্র ও যত আবেগময়, তাঁর কাব্যরচনাও তত সার্থক। কিন্তু লিরিক কিছু আলংকারিকদের কাব্যবিশ্লেষণের বাইরে নয়। ভাব যদি না কবির মনে রসের মূর্তি পরিগ্রহ করে, তবে কবি কখনও তাকে সে বিভাব ও অনুভাবে প্রকাশ করতে পারেন না, যা পাঠকের মনেও সেই রসের রূপ ফুটিয়ে তোলে। মনে যাতে ভাব উদ্‌বুদ্ধ হয়, তাই যদি কাব্য হত, তবে আজ বাংলাদেশে যে-সব হিন্দু মুসলমান খবরের কাগজ মুসলমানের উপর হিন্দুর, ও হিন্দুর উপর মুসলমানের ক্রোধকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, তারা প্রথম শ্রেণীর কাব্য হত। কারণ, অনেক হিন্দু-মুসলমানের ক্রোধই তাতে জাগ্রত হচ্ছে। অভিনবগুপ্ত উদাহরণ দিয়েছেন—'তোমার পুত্র জন্মেছে, এই কথা শুনে পিতার যে হর্ষ, তা রস নয়, এবং ও-বাক্যটিও কাব্য নয়।'

'পুত্রস্তে জাতঃ' ইত্যতো যথা হর্ষ জায়তে তথা নাপি লক্ষণয়া। অপি তু সহৃদয়স্য হৃদয়সংবাদবলাদ্বিভাবানুভাবপ্রতীতৌ সিদ্ধস্বভাবসুখাদিবিলক্ষণঃ পরিস্ফুরতি।—১।৪

'কিন্তু কবি সমুচিত বিভাব ও অনুভাবের দ্বারা, সহৃদয় পাঠকের সমবাদী তন্ময়ত্বপ্রাপ্ত মনে, ঐ হর্ষকেই, স্বভাবসিদ্ধ সুখ থেকে বিভিন্ন লক্ষণ, আস্বাদ্যমান রসের রূপে পরিণত করতে পারেন।' যেমন কালিদাস রঘুর জন্ম শ্রবণে দিলীপের 'হর্ষ'কে করেছেন—

জনায় শুদ্ধান্তচরায় শংসতে, কুমারজন্মামৃতসম্মিতাক্ষরম্।
অদেয়মাসীৎ ত্রয়মেব ভূপতেঃ, শশিপ্রভং ছত্রমুভে চ চামরে॥
নিবাতপদ্মস্তিমিতেন চক্ষুষা, নৃপস্য কান্তং পিবতঃ সুতাননম্।
মহোদধেঃ পূর ইবেন্দুদর্শনাদ্ গুরুঃ প্রহর্ষঃ প্রবভূব নাত্মনি॥

তবুও যে ভাবোদ্‌বেল কবির আবেগময় কাব্য কাব্যরস থেকে বঞ্চিত নয়, তার কারণ, ভাব "শব্দে সমর্পিত" হলেই ব্যক্তিগত

লৌকিকত্বের গণ্ডি থেকে কতকটা মুক্ত হয়। কেননা, ভাষা জিনিসটিই সামাজিক। কিন্তু লিরিক যত ভাব-ঘেঁষা হয় ততই যে শ্রেষ্ঠ হয় না, তা যে-কোনো শ্রেষ্ঠ কাব্যের উদাহরণ নিলেই দেখা যায়। ধরা যাক রবীন্দ্রনাথের 'অনন্ত প্রেম'।

তোমারেই যেন ভালোবাসিয়াছি শতরূপে শতবার।
জনমে জনমে, যুগে যুগে অনিবার।
...
আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি
যুগল প্রেমের স্রোতে,
অনাদিকালের হৃদয়উৎস হতে।
আমরা দু'জনে করিয়াছি খেলা
কোটি প্রেমিকের মাঝে,
বিরহবিধুর নয়নসলিলে
মিলনমধুর লাজে।
পুরাতন প্রেম নিত্যনূতন সাজে।

এর সঙ্গে যদি হেমচন্দ্রের "আবার গগনে কেন সুধাংশু উদয় রে," কি নবীনচন্দ্রের "কেন দেখিলাম," তুলনা করা যায়, তবেই কাব্যের রস ও ভাবের উচ্ছ্বাসের প্রভেদ হৃদয়ংগম হবে।

৪

আলংকারিকেরা বিভাব ও অনুভাব ছাড়া সঞ্চারী নামে কাব্য-কৌশলের যে তৃতীয় কলার উল্লেখ করেছেন, তার পরিচয় দিতে হলে, ভাবের যে মনোবিজ্ঞানের উপর আলংকারিকেরা তাঁদের রস-তত্ত্বের ভিত্তি গড়েছেন, তার একটু বিবরণ দিতে হয়।

মানুষের মনের ভাব বা ইমোশন অনন্ত। কারণ, ইমোশন শুদ্ধ feeling বা সুখদুঃখানুভূতি নয়। আধুনিক মনোবিদ্যাবিদ্‌দের

ভাষায় ইমোশন হচ্ছে একটি complete psychosis, সর্বাবয়ব মানসিক অবস্থা। অর্থাৎ ইমোশন বা ভাবের সুখদুঃখানুভূতি কতকগুলি idea বা বিজ্ঞানকে অবলম্বন ক'রে বিদ্যমান থাকে। এই আইডিয়াপুঞ্জের কোনো অংশের কিছু পরিবর্তন ঘটলেই, ইমোশন বা ভাব নামক মানসিক অবস্থাটিরও সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন ঘটে। আইডিয়ার সংখ্যা অগণ্য এবং তাদের পরস্পর যোগ-বিয়োগের প্রকার অসংখ্য। সুতরাং ভাব বা ইমোশন সংখ্যাতীত। এবং কোনো ভাব অন্য ভাবের সম্পূর্ণ সদৃশ নয়। কিন্তু তবুও, যেমন মনোবিজ্ঞানবিদ্, তেমনি আলংকারিক, কাজের সুবিধার জন্য, অগণ্য স্বলক্ষণ ভাবের মধ্যে কয়েক প্রকারের ভাবকে, সাদৃশ্যবশত কয়েকটি সাধারণ নামে নামাঙ্কিত ক'রে পৃথক্ করে নিয়েছেন। আলংকারিকেরা এই রকম নয়টি প্রধান ভাব স্বীকার করেছেন—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা, বিস্ময় ও শম।

রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেত্থমষ্টৌ প্রোক্তাঃ শমোঽপি চ॥

এই নয়টি ভাবকে তাঁরা বলেছেন, 'স্থায়ী ভাব'। কারণ,

> বহূনাং চিত্তবৃত্তিরূপাণাং ভাবানাং মধ্যে যস্য বহুলং রূপং যথোপলভ্যতে স স্থায়ী ভাবঃ।[১]

'ভাবরূপ বহু চিত্তবৃত্তির মধ্যে যে ভাব মনে বহুলরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইটি স্থায়ী ভাব।' আলংকারিকদের মতে এই নয়টি ভাব, কাব্যের বিভাব, অনুভাবের সংস্পর্শে, যথাক্রমে নয়টি রসে পরিণত হয়—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস, অদ্ভুত ও শান্ত।

শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসোঽদ্ভুত ইত্যষ্টৌ রসাঃ শান্তস্তথা মতঃ॥

কিন্তু এই নয়টি ছাড়াও অবশ্য মানুষের মনে বহু ভাব আছে, এবং

১ অভিনবগুপ্ত, ৩।২৪

তার মধ্যে অনেক ভাব, কাব্যের বিভাব ও অনুভাবে আলংকারিকদের কথায়, আস্বাদ্যমানতা প্রাপ্ত হয়। আলংকারিকেরা নির্বেদ, লজ্জা, হর্ষ, অসূয়া, বিষাদ প্রভৃতি এ রকম তেত্রিশটি ভাবের নাম করেছেন, এবং তা ছাড়াও যে আরও অনেক ভাব আছে, তা স্বীকার করেছেন।

ত্রয়স্ত্রিংশদিতি ন্যূনসংখ্যায়াঃ ব্যবচ্ছেদকং ন ত্বধিকসংখ্যায়াঃ।

এই-সব ভাবকে আলংকারিকেরা বলেছেন সঞ্চারী বা ব্যভিচারী ভাব। তাঁদের থিয়োরি হচ্ছে যে, এইসব ভাব মনে স্বতন্ত্র থাকে না; কোনো-না-কোনো স্থায়ী ভাবের সম্পর্কেই মনে যাতায়াত ক'রে সেই স্থায়ী ভাবের অভিমুখে মনকে চালিত করে। এইজন্য এদের নাম সঞ্চারী বা ব্যভিচারী।[1] ভাবের এই থিয়োরি থেকে স্বভাবতই রসের এই থিয়োরি এসেছে যে, কাব্যে সঞ্চারী ভাবের স্বতন্ত্র রসমূর্তি নেই; তাদের আস্বাদ্যমানতা স্থায়ী ভাবের পরিণতি নয়টি রসকেই নানা রকমে পরিপুষ্টি দান করে মাত্র। সুতরাং যদিও কাব্যের নব রসের রসত্ব অনেক পরিমাণে এই সঞ্চারীর আস্বাদের উপর নির্ভর করে, তবুও অনেক আলংকারিকই স্বাতন্ত্র্যের অভাবে, সঞ্চারী ভাবের পরিণতিকে রস বলতে রাজী নন। অভিনবগুপ্ত বলেছেন,

স চ রসো রসীকরণযোগ্যঃ, শেষাস্তু সংচারিণ ইতি ব্যাচক্ষতে।
ন তু রসানাং স্থায়িসংচারিভাবেনাঙ্গাঙ্গিতা যুক্তা।

'স্থায়ী ভাবের পরিণতিই রস, বাকিগুলিকে বলে সঞ্চারী। রসের মধ্যে আবার স্থায়ী রস ও সঞ্চারী রস এইভাবে অঙ্গী ও অঙ্গের বিভাগ যুক্তিযুক্ত নয়।' এবং তাঁর মতই অধিকাংশ আলংকারিকের মত। কিন্তু স্থায়ী ও সঞ্চারীর এই প্রভেদ কিছু মূলগত প্রভেদ নয়; এবং সঞ্চারী ভাবের স্বতন্ত্র রসে পরিণতি সম্ভব নয়, এও একটু

১ স্থিরতয়া বর্তমানে হি রত্যাদৌ নির্বেদাদয়ঃ প্রাদুর্ভাবতিরোভাবাভ্যামাভিমুখ্যেন চরণাদ্ব্যভিচারিণ কথ্যন্তে।— সাহিত্যদর্পণ

অতিসাহসের কথা। সেইজন্য আলংকারিকদের মধ্যে এ মতও প্রচলিত ছিল যে, সঞ্চারী ও রস কেবল রসের পরিপুষ্টিসাধক নয়। অভিনবগুপ্ত ভাগুরি নামে এক আলংকারিকের মত তুলেছেন,

তথা চ ভাগুরিরপি কিং রসনামপি স্থায়িসংচারিতাস্তি ইত্যাক্ষিপ্যাভ্যুপগমেনৈত্তরবোচৎ বাঢ়মস্তীতি।

'রসেরও কি আবার স্থায়ী ও সঞ্চারী ভেদ আছে। এর উত্তরে ভাগুরিও বলেছেন, অবশ্য আছে।' এবং সকল আলংকারিককে স্বীকার করতে হয়েছে যে, কাব্যে স্থায়ী ও সঞ্চারী এই ভেদটি আপেক্ষিক। কারণ, এক কাব্যপ্রবন্ধে যখন নানা রস থাকে, তখন দেখা যায় যে, তার মধ্যে একটি রস প্রধান এবং স্থায়ী ভাবের পরিণতি, অন্য রস তার পরিপোষক হয়ে সঞ্চারীর কাজ করছে।

রসো রসান্তরস্য ব্যভিচারী ভবতি[1]

'এক রস অন্য রসের ব্যভিচারীর কাজ করে।'

প্রসিদ্ধেঽপি প্রবন্ধানাং নানারসনিবন্ধনে।
একো রসোঽঙ্গীকর্তব্যস্তেষামুৎকর্ষমিচ্ছতা॥[2]

'এক কাব্যপ্রবন্ধে নানা রস একত্র থাকলেও দেখা যায়, কবিরা কাব্যের উৎকর্ষের জন্য তার মধ্যে একটি রসকেই প্রধান করেন।' এবং বাকি রসগুলি তার পরিপোষক বা সঞ্চারী। এই সঞ্চারী কাব্যের এতটা স্থান জুড়ে থাকে যে, আলংকারিকদের মধ্যে এ মতও চলতি হয়েছিল যে, সঞ্চারী দিয়ে পরিপুষ্ট না হলে রসের রসত্বই হয় না।

পরিপোষরহিতস্য কথং রসত্বম্।[3]

কবিরাজ বিশ্বনাথ যে কারিকায় রসের উৎপত্তির বর্ণনা দিয়েছেন, 'সাহিত্য-দর্পণ'-এর সেই কারিকাটি এখন উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

১ ধ্বন্যালোক, ৩।২৪ ২ ধ্বন্যালোক, ৩।২১ ৩ ধ্বন্যালোক, ৩।২৫, বৃত্তি

বিভাবেনাহুভাবেন
ব্যক্তঃ সঞ্চারিণা তথা
রসতামেতি রত্যাদিঃ
স্থায়ী ভাবঃ সচেতসাম্ ॥

'চিত্তের রতি প্রভৃতি স্থায়িভাব, (কাব্যের) বিভাব, অনুভাব ও সঞ্চারীর সংযোগে, রূপান্তর প্রাপ্ত হয়ে, রসে পরিণত হয়।' আশা করা যায়, এর আর এখন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

৫

আলংকারিকদের রসের তত্ত্ব একটা উদাহরণে বিশদ করা যাক।

পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস শেষ হয়েছে। সঞ্জয় এসে যুধিষ্ঠিরকে সংবাদ দিলেন, দুর্যোধন বিনা যুদ্ধে কিছুই ছেড়ে দেবে না। মন্ত্রণাসভায় স্থির হল, শ্রীকৃষ্ণকে দূত করে ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্যোধনের কাছে পাঠান হোক। যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে সকলেই মত দিলেন, যুদ্ধ না করে শান্তিতেই যাতে বিবাদ মীমাংসা হয়, সেই চেষ্টা করা কর্তব্য। ভীম শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, 'যাতে শান্তি স্থাপন হয়, সেই চেষ্টা কোরো; দুর্যোধনকে উগ্র কথা না বলে মিষ্ট কথায় বুঝিয়ো।' শ্রীকৃষ্ণ হেসে বললেন, 'ভীমের এই অক্রোধ অভূতপূর্ব। এ যেন ভারহীন পর্বত তাপহীন অগ্নি।' কেবল সহদেব ও সাত্যকি সোজাসুজি যুদ্ধের পক্ষে মত দিলেন। তখন—

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
কৃষ্ণা দাশার্হমাসীনমব্রবীচ্ছোককর্ষিতা ॥
সুতা দ্রুপদরাজস্য স্বসিতায়তমূর্ধজা।
সম্পূজ্য সহদেবঞ্চ সাত্যকিঞ্চ মহারথম্।
ভীমসেনঞ্চ সংশান্তং দৃষ্ট্বা পরমদুর্মনাঃ।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা বাক্যমুবাচেদং যশস্বিনী ॥

কা নু সীমন্তিনী মাদৃক্ পৃথিব্যামস্তি কেশব ॥
সুতা দ্রুপদরাজস্য বেদীমধ্যাৎ সমুত্থিতা।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ভগিনী তব কৃষ্ণ প্রিয়া সখী ॥
আজমীঢ়কুলং প্রাপ্তা স্নুষা পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ।
মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং পঞ্চেন্দ্রসমবর্চসাম্ ॥
সাহং কেশগ্রহং প্রাপ্তা পরিক্লিষ্টা সভাং গতা।
পশ্যতাং পাণ্ডুপুত্রাণাং ত্বয়ি জীবতি কেশব ॥
জীবৎসু পাণ্ডুপুত্রেষু পাঞ্চালেম্বথ বৃষ্ণিষু।
দাসীভূতাস্মি পাপানাং সভামধ্যে ব্যবস্থিতা।

...

ধিক্ পার্থস্য ধনুষ্মত্তাং ভীমসেনস্য ধিগ্ বলম্।
যত্র দুর্যোধনঃ কৃষ্ণ মুহূর্তমপি জীবতি ॥
যদি তেঽহমনুগ্রাহ্যা যদি তেঽস্তি কৃপা ময়ি।
ধার্তরাষ্ট্রেষু বৈ কোপঃ সর্বঃ কৃষ্ণ বিধীয়তাম্ ॥
ইত্যুক্ত্বা মৃদুসংহারং বৃজিনাগ্রং সুদর্শনম্।
সুনীলমসিতাপাঙ্গী সর্বগন্ধাধিবাসিতম্ ॥
সর্বলক্ষণসম্পন্নং মহাভুজগবর্চসম্।
কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য ব্যমেন পাণিনা ॥
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।
অশ্রুপূর্ণেক্ষণা কৃষ্ণা কৃষ্ণং বচনমব্রবীৎ ॥
অয়ন্তু পুণ্ডরীকাক্ষ দুঃশাসনকরোদ্ধৃতঃ।
স্মর্তব্যঃ সর্বকার্যেষু পরেষাং সন্ধিমিচ্ছতা ॥
যদি ভীমার্জুনৌ কৃষ্ণ কৃপণৌ সন্ধিকামুকৌ।
পিতা মে যোৎস্যতে বৃদ্ধঃ সহ পুত্রৈর্মহারথৈঃ ॥
পঞ্চ চৈব মহাবীর্যাঃ পুত্রা মে মধুসূদন।
অভিমন্যুং পুরস্কৃত্য যোৎস্যন্তে কুরুভিঃ সহ ॥
দুঃশাসনভুজং শ্যামং সংছিন্নং পাংশুগুণ্ঠিতম্।
যদ্যহন্তু ন পশ্যামি কা শান্তির্হৃদয়স্য মে ॥

ত্রয়োদশ হি বর্ষাণি প্রতীক্ষন্ত্যা গতানি মে।
নিধায় হৃদয়ে মন্যুং প্রদীপ্তমিব পাবকম্ ॥
বিদীর্যতে মে হৃদয়ং ভীমবাক্‌শল্যপীড়িতম্।
যোঽয়মদ্য মহাবাহুর্ধর্মমেবানুপশ্যতি ॥
ইত্যুক্ত্বা বাষ্পরুদ্ধেন কণ্ঠেনায়তলোচনা।
রুরোদ কৃষ্ণা সোৎকম্পং সস্বরং বাষ্পগদ্‌গদম্ ॥[১]

'ঘোরকৃষ্ণআয়তকেশা, যশস্বিনী দ্রুপদনন্দিনী ধর্মরাজের ধর্মার্থযুক্ত বাক্য শ্রবণ ও ভীমসেনের প্রশান্তভাব অবলোকনে শোকে একান্ত অভিভূত হইয়া সহদেব ও সাত্যকিকে পূজা করত অশ্রুপূর্ণলোচনে কৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন, "হে কেশব, এই ভূমণ্ডলমধ্যে আমার তুল্য নারী আর কে আছে। আমি দ্রুপদরাজের যজ্ঞবেদিসমুত্থিতা কন্যা, ধৃষ্টদ্যুম্নের ভগিনী, তোমার প্রিয়সখী, আজমীঢ়কুলসম্ভূত পাণ্ডুরাজের স্নুষা ও পঞ্চ ইন্দ্রের তুল্য পাণ্ডবগণের মহিষী। সেই আমি, তুমি এবং পাঞ্চাল ও বৃষ্ণিগণ জীবিত থাকিতেই পাণ্ডুনন্দনগণের সমক্ষে সভামধ্যে কেশাকর্ষণে পরিক্লিষ্টা হইয়াছি, পাপপরায়ণ ধার্তরাষ্ট্রগণের দাসী হইয়াছি। পার্থের ধনুর্বিদ্যা ও ভীমসেনের বলে ধিক্ যে দুর্যোধন এখনও জীবিত আছে। হে কৃষ্ণ, যদি আমার প্রতি তোমার অনুগ্রহ ও কৃপা থাকে, তাহা হইলে অচিরাৎ ধৃতরাষ্ট্রতনয়গণের উপর ক্রোধাগ্নি নিক্ষেপ কর।"

'অসিতাপাঙ্গী দ্রুপদনন্দিনী এই কথা বলিয়া কুটিলাগ্র, সুদর্শন, ঘোরকৃষ্ণ, সর্বগন্ধাধিবাসিত, সর্বলক্ষণসম্পন্ন, মহাভুজগসদৃশ বেণীবদ্ধ কেশকলাপ বামহস্তে ধারণ করিয়া গজগমনে পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণের নিকটে উপস্থিত হইয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে পুনরায় কহিতে লাগিলেন, "হে পুণ্ডরীকাক্ষ, যদি শত্রুগণ সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই কেশকলাপ স্মরণ করিয়ো। হে কৃষ্ণ,

১ মহাভারত, উদ্যোগপর্ব, ৮১

যদি ভীমার্জুন দীনের ন্যায় সন্ধিকামী হয়েন, তবে আমার বৃদ্ধ পিতা মহারথ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিবেন। আমার মহাবল পরাক্রান্ত পঞ্চ পুত্র অভিমন্যুকে পুরস্কৃত করিয়া কৌরবগণকে সংহার করিবে। দুরাত্মা দুঃশাসনের শ্যামল বাহু ছিন্ন, পাংশুগুণ্ঠিত না দেখিলে আমার হৃদয়ে শান্তি কোথায়। আমি হৃদয়-ক্ষেত্রে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় ক্রোধকে স্থাপন করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর প্রতীক্ষা করিয়া আছি। আজ ধর্মপথাবলম্বী বৃকোদরের বাক্যশল্যে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।" আয়তলোচনা কৃষ্ণা এই কথা বলিয়া বাষ্পগদগদস্বরে, কম্পিত-কলেবরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।'

ব্যাসের এই মহাকাব্যখণ্ডের কাব্যত্ব সম্বন্ধে কোনো কাব্যরসিককে সচেতন করতে হবে না। ওর কাব্যের দ্যুতি মধ্যাহ্নের সূর্যের মতো স্বপ্রকাশ। এখন আলংকারিকদের কাব্যবিশ্লেষণ ওতে প্রয়োগ করে দেখা যাক।

আলংকারিকেরা বলবেন, এ কাব্যের আত্মা হচ্ছে কয়েকটি রস; কিন্তু কাব্যটি "নানারসনিবদ্ধ" হলেও কবি একটি রসকেই প্রধান করেছেন। সে রস 'রৌদ্র' রস। রৌদ্র রসের লৌকিক ভাব-উপাদান হচ্ছে ক্রোধ। বাস্তব জীবনে ক্রোধ মনোহারী জিনিস নয়। কিন্তু মহাকবির প্রতিভার মায়া দ্রৌপদীর ক্রোধকে অপূর্ব রসমূর্তিতে পরিণত করেছে। রৌদ্র রসের বিভাব হচ্ছে লৌকিক জগতে যাতে ক্রোধ উদ্দীপ্ত হয় তার শব্দে সমর্পিত হৃদয়সংবাদী চিত্র। দুর্যোধন, দুঃশাসন ও তাদের নিদারুণ অপমানের সেই চিত্র এখানে সামান্য কয়েকটি রেখায় ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। কারণ, সভাপর্বে তার অত্যুগ্র, উজ্জ্বল ছবি সহৃদয় পাঠকের চিত্তকে পূর্ব থেকেই ক্রোধের রৌদ্ররাগে রক্তিম করে রেখেছে।

কিন্তু রৌদ্র রসই যদি এ কাব্যের একমাত্র রস হত, তবে এর

কাব্যত্বের শতাংশও অবশিষ্ট থাকত না। আলংকারিকেরা বলবেন, কয়েকটি সঞ্চারী এর রৌদ্র রসকে আশ্চর্য সরসতা ও পরম উৎকর্ষ দিয়েছে। নব রসের দুটি প্রধান রস, বীর ও করুণ, এবং কয়েকটি ব্যভিচারী— বিষাদ, গর্ব, দৈন্য— রৌদ্রের রক্তরাগকে অপূর্ব বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত করে তুলেছে।

তেজস্বিনী দ্রৌপদীর শোককর্ষিত, অশ্রুলোচন, বিষাদমূর্তিতে কাব্যের আরম্ভ হল। তার পর দ্রৌপদীর পিতৃকুল, পতিকুল ও মিত্রসৌভাগ্যের যে গর্ব, তা শোকের করুণ রসকেই গভীর করেছে। আর শোকের অন্তরে ক্রোধ তার রৌদ্রের রক্তিম দ্যুতি করুণ রসের অশ্রুজলে রক্তের রামধনু ছিটিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু আবার মুহূর্তেই রৌদ্রের উদ্ধত রাগ দীনতার পাণ্ডুচ্ছায়ায় মিলিয়ে গেছে।

মহাভারতকার যে দুটি শ্লোকে দ্রৌপদীর মহাভুজঙ্গের মতো দীর্ঘ বেণীর ছবি এঁকেছেন, সেই বেণী, যা অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ক্ষত্রিয়ের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করবে, আলংকারিকেরা তাকেই বলেন কাব্যের বিভাব। এ কাব্যের সমস্ত রসের অবলম্বন হচ্ছে দ্রৌপদী। সুতরাং সেইসব রসের অনুগত দ্রৌপদীর ও তার চেষ্টার ছবি,

কেশপক্ষং বরারোহা গৃহ্য বামেন পাণিনা
পদ্মাক্ষী পুণ্ডরীকাক্ষমুপেত্য গজগামিনী।

এ কাব্যের বিভাব। বলা বাহুল্য, এর মতো বিভাব মহাকবিতেই সম্ভব। অন্য কবির হয় এ ছবি কল্পনায় আসত না, না-হয় বেণীর বর্ণনায় শ্লোকের পর শ্লোক চলত।

এর পর দ্রৌপদীর বাক্য করুণ ও রৌদ্রের এক অপরূপ মিশ্রণ নিয়ে আরম্ভ হয়েছে। "হে পুণ্ডরীকাক্ষ, যদি কখনও সন্ধির কথা মনে হয়, দুঃশাসনকরোদ্ধৃত আমার এই বেণীর কথা মনে কোরো।" এবং এই মিশ্র রস বীর-পিতা, বীর-ভ্রাতা ও বীর-পুত্র ক্ষত্রিয়নারীর বীর রসের তাপে তপ্ত হয়ে রৌদ্রের বহ্নিরাগে দপ্‌ করে জ্বলে উঠেছে। এবং

অভিমান ও শোকের অশ্রুজলে কাব্য শেষ হলেও, সে করুণ রস মুখ্য রৌদ্র রসকে নির্বাপিত না করে, তাকে পরিপুষ্ট ও স্থায়ী করেছে। যে শোকের ছবিতে কাব্য সমাপ্ত, সে ছবি কয়েকটি অনুভাব দিয়ে আঁকা। লৌকিক শোক যা দিয়ে বাইরে প্রকাশ হয়, ও ছবি তারই কাব্যে সমর্পিত রসমূর্তি।

এ কাব্যের রসের বিবরণ এখনও শেষ হয় নি। কারণ, এর রৌদ্র, বীর, করুণ সমস্ত রসের অন্তরালে আর-একটি রসের মূর্তি উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে। এ কাব্যের ক্রোধ, বীরত্ব, শোক— সকলই যে তেজস্বিনী সুন্দরী নারীর ক্রোধ, বীর্য ও শোক, কবি এ কথা বিস্মৃত হতে দেন নি। সমস্ত কাব্যের মধ্যেই সে-স্মৃতির উদ্‌বোধ ছড়িয়ে রেখেছেন। মধুর বা শৃঙ্গার রসের বিভাব সুন্দরী নারীর সংস্পর্শ এর রৌদ্র, বীর, করুণ, সমস্ত রসের উপরেই একটা মাধুর্যের রশ্মিপাত করেছে।

এ কাব্যে রৌদ্র ও বীর রস পাশাপাশি রয়েছে। একটু অবান্তর হলেও এদের প্রভেদটা একটু স্পষ্ট করা বোধ হয় নিরর্থক নয়। রৌদ্র রসের ভাবের উপাদান হল ক্রোধ, কিন্তু বীর রসের ভাবের উপাদান হচ্ছে উৎসাহ। যাত্রার বীর রস যে হাস্যাস্পদ, তার কারণ যাত্রাওয়ালা রৌদ্র রসকে বীর রস বলে ভুল করে। তার মনে ধারণা যে, বীর রসের উপাদান ক্রোধ। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে"— আলংকারিকদের মতে বীর রসের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। আর "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়।"— কবি বীর রসের কবিতা মনে করে লিখলেও আলংকারিকেরা ওকে কখনই বীর রস বলতে রাজী হতেন না। কারণ, ওটি 'উৎসাহের' রসমূর্তি নয়।

আলংকারিকদের এই কাব্যবিশ্লেষণ যে আধুনিক constructive criticism, 'গঠনমূলক' সমালোচনায় অভ্যস্ত পাঠকের মনে ধরবে না, তা বেশ জানি। কিন্তু আলংকারিকেরা কাব্য নিয়ে কবিত্ব করার

পক্ষপাতী ছিলেন না। কাব্যের গাঢ় রাগকেস মালোচনার ফিকে রঙে এঁকে কার কী হিত হয়, তা তাঁদের বুদ্ধির অতীত ছিল। অধিকাংশ constructive criticism হয় কাব্যের রসকে রসহীন বাক্যের জল মিশিয়ে পাতলা করে পাঠকদের সামনে ধরা, না-হয় কাব্যের ইমোশনকে সমালোচনার sentimentalismএর একটা উপলক্ষ্য করা। আলংকারিকেরা বুঝেছিলেন, কাব্যের তত্ত্ববিশ্লেষণ রসজ্ঞের বুদ্ধির ব্যাপার। কাব্যের রস, দরকার হলে পাতলা ক'রে, পাঠককে গিলিয়ে দেওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। কারণ, ও-কাজে কেউ কখনও সফলকাম হতে পারবে না। আলংকারিকেরা জানতেন, কাব্যের রস-আস্বাদন লোকে কাব্য পড়েই করবে। সমালোচকের 'কবিত্ব' পড়ে কাব্যের রসাস্বাদনের আধুনিক তত্ত্ব তাঁদের জানা ছিল না। সমালোচনার কবিত্ব কাব্যের রস মনে সঞ্চার করতে পারে যদি সমালোচক হন একাধারে সমালোচক ও কবি। এ যোগ দুর্লভ। আলংকারিকেরা জানতেন, তাঁরা কাব্যতত্ত্ববিৎ সহৃদয় মাত্র।

কথা

তত্ত্বজ্ঞেরা বলেছেন, আত্মাকে জানতে হলে নেতি নেতি করে আরম্ভ করতে হয়। বুঝতে হয়, আত্মা দেহ নয়, প্রাণ নয়, মন নয়, বিজ্ঞান নয়, তবেই আত্মার প্রকৃত স্বরূপের প্রতীতি হয়। কাব্যের আত্মার সন্ধানে আলংকারিকেরাও এই নেতির পথ নিয়েছেন। কাব্যের আত্মা তার শব্দার্থময় কথা-শরীর নয়, তার বাচ্যের বিশিষ্টতা নয়, তার রচনা-রীতির চমৎকারিত্ব নয়, অলংকারের সৌকুমার্য নয়। কাব্যের আত্মা এ সবার অতিরিক্ত আনন্দস্বরূপ বস্তু, অর্থাৎ রস। কিন্তু এ আত্মা নির্গুণ নিরুপাধিক আত্মা নয়, যেখানে পৌঁছলে "নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি", দেখার, শোনার, কি জানার আর কিছু থাকে না ; দগ্ধকাষ্ঠ আগুনের মতো সব নির্বাণপ্রাপ্ত হয়। কাব্যের রস সেই সগুণ, সক্রিয় আত্মা, "সর্বাণি রূপাণি বিচিত্য ধীরো, নামানি কৃত্বাভিবদন যদাস্তে", যা নানা রূপের সৃষ্টি ক'রে তাকে নামের গড়নে বেঁধে, নিজের সেই সৃষ্টির মধ্যেই আবিষ্ট হয়ে বিরাজ করে। কবির কাজ পাঠকের চিত্তে রসের উদ্‌বোধন। কিন্তু রস কবির মন থেকে পাঠকের মনে সোজাসুজি উপায়নিরপেক্ষ সঞ্চারিত হয় না। শব্দ ও অর্থের, বাচক ও বাচ্যের উপায়কে আশ্রয় করেই কবি এই উদ্দেশ্য সাধন করেন। সুতরাং যদিও কবির চরম লক্ষ্য পাঠকের মনের ভাবকে রসে রূপান্তর করা, তাঁর কাব্য-সৃষ্টি হচ্ছে এই উপায়ের সৃষ্টি।

আলোকার্থী যথা দীপশিখায়াং যত্নবান্ জনঃ।
তদুপায়তয়া তদ্বদর্থে বাচ্যে তদাদৃতঃ ॥[১]

'লোকে আলো চায়, কিন্তু তাকে জ্বালাতে হয় দীপশিখা। কবির লক্ষ্য রস, কিন্তু তাঁকে সৃষ্টি করতে হয় কাব্যের শব্দার্থময় কথাবস্তু।' এই কথাবস্তু যদি সহৃদয় পাঠকের মনে অভিপ্রেত রসসঞ্চারের উপযোগী হয়, তবেই কবির কাজ শেষ হল। এর অতিরিক্ত তাঁর সাধ্যের

১ ধ্বন্যালোক, ১।৯

অতীত। কারণ, কাব্য কোনও পাঠকবিশেষের মনে রসের উদ্রেক করবে কি না, তা কেবল কাব্যের উপর নির্ভর করে না, পাঠকের মনের উপরেও নির্ভর করে। কবি যে ভাবকে রসমূর্তি দিতে চান, যদি পাঠকের মন সে ভাব সম্বন্ধে কতকটাও কবির মনের সমধর্মী না হয়, তবে সে-পাঠকের কাছে কাব্য ব্যর্থ। এই কারণেই কবি বররুচি অরসিকের কাছে রসনিবেদনের দুঃসহ দুঃখ থেকে ইষ্টদেবতার কাছে মুক্তি চেয়েছেন; আর ভবভূতি অনন্ত কাল ও বিপুল পৃথিবীতে সমানধর্মা পাঠকের কাছে একদিন-না-একদিন কাব্য পৌঁছাবে, এই ভরসায় আশ্বস্ত হয়েছেন। কাব্যে কেন সকল লোকের মনে রসের অভিব্যক্তি হয় না, আলংকারিকেরা বলেছেন, তার কারণ ভাবের 'বাসনা'র অভাব। —ন জায়তে তদা স্বাদো বিনা রত্যাদিবাসনম্ ॥[১] বাসনা হচ্ছে অনুভূত ভাব বা জ্ঞানের সংস্কারলেশ, যাকে আশ্রয় ক'রে পূর্বানুভূতির স্মৃতি মনে জাগ্রত হয়। এই বাসনা আছে বলেই কাব্যের ভাবচিত্র মনে রসের সঞ্চার করে। আর এ বাসনা নেই বলেই বালকের কাছে চণ্ডীদাসের কাব্য নিষ্ফল। কাব্য যে-ভাবকে রসে পরিণত করতে চায়, যে-পাঠকের মনে তার বাসনা নেই, তার বয়স যতই হোক, সে-কাব্যসম্পর্কে সে শিশু; অর্থাৎ ও-কাব্য তার জন্যে নয়। ভাবের অনুভূতি, সুতরাং বাসনা আছে, কিন্তু তার রসের আস্বাদন নেই— এরকম লোক অবশ্য অনেক আছে। আলংকারিকেরা বলেন, তার কারণ 'প্রাক্তন', অর্থাৎ পূর্বজন্মের কর্মফল। 'রসাস্বাদশক্তির স্বাভাবিক অভাব' বললে ভাষাটা আধুনিক শোনায় বটে, কিন্তু কথা একই থেকে যায়।

কাব্যের লক্ষ্য রস; শব্দ, বাচ্য, রীতি, অলংকার, ছন্দ— তার উপায়। কিন্তু এই উদ্দেশ্য ও উপায়ের যে বিশ্লেষণ, সে হচ্ছে বুদ্ধির কাব্যপরীক্ষার বিশ্লেষণ। কবির কাব্যসৃষ্টিতে ও সহৃদয়ের কাব্যের

১ সাহিত্যদর্পণ

আস্বাদে, রস ছাড়া এ-সব উপায়ের স্বতন্ত্র পরিকল্পনা কি আস্বাদন নেই। কারণ, কাব্যের বাচ্য, রীতি, ছন্দ, অলংকার— এইসব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু একত্র হয়ে কাব্যের রসকে সৃষ্টি করে না। রসই নিজেকে মূর্ত্ত ক'রে তোলার আবেগে কাব্যের এইসব অঙ্গের সৃষ্টি করে। যেমন নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মিলনে জীবশরীরে প্রাণের সৃষ্টি হয় নি, প্রাণশক্তিই অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সৃষ্টি ক'রে নিজেকে তার মধ্যে প্রকাশ করেছে। সুতরাং কাব্যের এ সব অঙ্গ তার রসের বহিরঙ্গ নয়, তারা রসেরই অঙ্গ। —তস্মান্ন তেষাং বহিরঙ্গত্বং রসাভিব্যক্তৌ।[১] অর্থাৎ রসবাদী আলংকারিকেরা হচ্ছেন কাব্যমীমাংসায় অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী। চেতনাচেতন এই জগৎ পরমাত্মা ব্রহ্ম নয়, কিন্তু তা থেকে ভিন্নও নয়। কাব্যের এইসব অঙ্গ কাব্যের আত্মা, রস নয়, কিন্তু রস থেকে ভিন্নও নয়। কারণ, কাব্যের রস এইসব কাব্যাঙ্গ থেকে পৃথগ্ব্যপদেশানর্হ, পৃথগ্‌ভাবে নির্দেশের অযোগ্য। এই আপাতবিরুদ্ধ ভেদাভেদ সম্বন্ধ কী ক'রে সম্ভব হয়, তা তর্ক দিয়ে প্রতিষ্ঠার বিষয় নয়; তত্ত্বদর্শী ও কাব্যরসিকের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বস্তু।

রসবাদীদের এই সিদ্ধান্ত যে কাব্যের ভূমি ছেড়ে তত্ত্বের আকাশে উধাও হওয়া নয়, তার প্রমাণে তাঁরা বলেন, মহাকবিদের শ্রেষ্ঠ কাব্যমাত্রেই দেখা যাবে যে, তার ভাষা কি অলংকার অপৃথগ্-যত্ননির্বর্ত্য, অর্থাৎ তার জন্য কবির কোনও পৃথক্ যত্ন করতে হয় নি।[২] কারণ—

রসবন্তি হি বস্তূনি সালংকারাণি কানিচিৎ
একেনৈব প্রযত্নেন নির্বর্ত্যন্তে মহাকবেঃ।[৩]

১ ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি

২ রসাক্ষিপ্ততয়া যস্য বন্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেৎ।
অপৃথগ্‌যত্ননির্বর্ত্যঃ সোঽলংকারো ধ্বনৌ মতঃ।—ধ্বন্যালোক, ২।১৭

৩ ধ্বন্যালোক, ২।১৭, বৃত্তি

'কাব্যের রসবস্তু ও তার অলংকার মহাকবির এক প্রযত্নেই সিদ্ধ হয়।' কেননা যদিও বিশ্লেষণবুদ্ধির কাছে তাদের রচনাভঙ্গি ও অলংকারপ্রয়োগের কৌশল নিরূপণ দুর্ঘট ও বিস্ময়াবহ, কিন্তু প্রতিভাবান্ কবির রসসমাহিত চিত্ত থেকে তারা ভিড় ক'রে ঠেলাঠেলি বেরিয়ে আসে—

> অলংকারান্তরাণি হি নিরূপ্যমাণদুর্ঘটনান্যপি রসসমাহিতচেতসঃ প্রতিভানবতঃ কবেরহংপূর্বিকয়া পরাপতন্তি।[১]

> Canst thou not minister to a mind diseas'd ;
> Pluck from the memory a rooted sorrow ;
> Raze out the written troubles of the brain ;
> And with some sweet oblivious antidote
> Cleanse the stuff'd bosom of that perilous stuff
> Which weighs upon the heart ?

এই কাব্যাংশের অদ্ভুত কবিকর্ম, এর পরমাশ্চর্য নৈপুণ্য ও কৌশল, এর ভাষা ও অলংকারের বিস্ময়কর প্রকাশশক্তি, যা প্রতিছত্রে দুটি-একটি কথায় উদ্দিষ্ট আইডিয়ার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ফুটিয়ে তুলেছে— রসজ্ঞ সমালোচক এগুলির প্রতি যে বিশ্লেষণবুদ্ধি প্রয়োগ করবেন, কবিকেও যদি তেমনি বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করতে হত, তবে এ কাব্যের সৃষ্টিই হত না। কবির দৃষ্টি সমাহিত ছিল তাঁর নাটকের নায়কের হৃদয়শোষী যন্ত্রণাক্লিষ্ট চিত্তের নিদারুণ চিত্রের দিকে ; আর তাঁর মহাপ্রতিভা তার কাব্যোপকরণ আপনি উপহার এনেছে, বুদ্ধি দিয়ে অন্বেষণ ক'রে তাকে আনতে হয় নি।

আনন্দবর্ধন বলেছেন, এমনটি যে ঘটে, তার কারণ, কবি তাঁর কাব্যের বাচ্য দিয়েই রসকে আকর্ষণ করেন ; এবং শ্রেষ্ঠ কাব্যের ভাষা ও অলংকার তার বাচ্য থেকে স্বতন্ত্র বস্তু নয়, তারা বাচ্যেরই অঙ্গ।

১. ধ্বন্যালোক, ২।১৭

যুক্তং চৈতৎ। যতো রসা বাচ্যবিশেষৈরেবাক্ষেপ্তব্যাঃ। তৎপ্রতিপাদকৈশ্চ শব্দৈস্তৎপ্রকাশিনো বাচ্যবিশেষা এব রূপকাদয়োঽলংকারাঃ।[1]

কালিদাসের উপমার যে খ্যাতি, তার কারণ এ নয় যে, সেগুলির উপমান ও উপমেয়ের মিলের পরিমাণ ও চমৎকারিত্ব খুব বেশি। তাদের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে, সেগুলি কাব্যের বাচ্যকে সাজানোর জন্য কটককুণ্ডলের মতো বাইরে থেকে আনা অলংকার নয়। সেগুলি বাচ্যের শোভা— যৌবন যেমন দেহের শোভা। বাচ্য থেকে তাদের প্রভেদ করা যায় না, কিন্তু কাব্যের বাচ্যকে তারা রস আকর্ষণের অদ্ভুত ক্ষমতা দেয়।

অবৃষ্টিসংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাতনিষ্কম্পমিব প্রদীপম্॥

এর বাচ্য ও উপমার মধ্যে কোনো ভেদরেখা টানা যায় না। এর বাচ্যই উপমা, উপমাই বাচ্য। এবং ফলে শম্ভুর চিন্তাতেও যে অধৃষ্য রূপ, যা দেখে মদনের হাত থেকেও ধনু ও শর খসে পড়েছিল, তার দীপ্তগম্ভীর রসে পাঠকের চিত্ত ভ'রে যায়।

সব শ্রেষ্ঠ কাব্যের অলংকারের এই এক ধারা। মহাভারতের বিদুলার উপাখ্যানে বিদুলা তার শত্রুনির্জিত, দীনচিত্ত, নিরুদ্যম পুত্রকে উত্তেজিত করছে,

অলাতং তিন্দুকস্যেব মুহূর্তমপি হি জ্বল।
মা তুষাগ্নিরিবানর্চির্ধূমায়স্ব জিজীবিষুঃ॥
মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন তু ধূমায়িতম্ চিরম্।

'তিন্দুকের[2] অঙ্গারের মতো এক মুহূর্তের জন্যও জ্বলে ওঠো; প্রাণের মায়ায় শিখাহীন তুষের আগুনের মতো ধূমায়মান থেকো না। চিরদিন ধূমায়িত থাকার চেয়ে মুহূর্তের জন্য জ্ব'লে ভস্ম হওয়াও শ্রেয়ঃ।' এর

১ ধ্বন্যালোক, ২।১৭ ২ গাবগাছ

বাচ্য ও অলংকারে ভেদ নেই, এবং সেই অভেদ এই দেড়টি শ্লোককে রসোদ্‌বোধনের আশ্চর্য শক্তি দিয়েছে। রামায়ণে হেমন্তের নিষ্প্রভ চন্দ্রের বর্ণনা,

রবিসংক্রান্তসৌভাগ্যস্তুষারারুতমণ্ডলঃ।
নিঃশ্বাসান্ধ ইবাদর্শশ্চন্দ্রমা ন প্রকাশতে॥

'তুষারাবৃত আকাশে নিঃশ্বাসান্ধ দর্পণের মতো চন্দ্র প্রকাশহীন।'— এ উপমা একটা উদাহরণ নয়; হেমন্তের বিলুপ্তজ্যোতি চন্দ্রের সমস্তটা রূপ ফুটিয়ে তুলেছে। রবীন্দ্রনাথের "পঁচিশে বৈশাখ"—

আর সে একান্তে আসে
মোর পাশে
পীত উত্তরীয়তলে লয়ে মোর প্রাণদেবতার
স্বহস্তে সজ্জিত উপহার—
নীলকান্ত আকাশের থালা,
তারি 'পরে ভুবনের উচ্ছলিত সুধার পেয়ালা।

এর বাচ্য ও অলংকারে প্রভেদ করবে কে। কারণ, এর অলংকার এর বাচ্যের শোভা নয়, রূপ। আর তাতেই এ কবিতার বাচ্যের পেয়ালা থেকে কাব্যের রস উচ্ছলিত হয়ে পড়ছে।

২

আলংকারিকেরা যখন বলেন, কাব্যের 'বাচ্য' তার দেহ, 'রীতি' যেন অবয়বসংস্থান, 'অলংকার' কটককুণ্ডলাদির মতো আভরণ[১]— তখন তাঁরা নিম্ন অধিকারীর জন্য কাব্যের বাহ্যতত্ত্ব বলেন, নিগূঢ় চরমতত্ত্ব নয়। কারণ, কাব্যে তার বাচ্য, রীতি, অলংকারের কোনো স্বাতন্ত্র্য নেই, তারা একান্ত রসপরতন্ত্র। রীতি অলংকার যদিও বাহ্যতঃ বাচ্যের

১ অলংকারাঃ কটককুণ্ডলাদিবৎ। রীতয়োঽবয়বসংস্থানবিশেষবৎ। দেহদ্বারেণেব শব্দার্থদ্বারেণ তমেব কাব্যস্যাত্মভূতরসমুৎকর্ষয়ন্তঃ কাব্যস্যোৎকর্ষকা উচ্যন্তে।—সাহিত্যদর্পণ

ভঙ্গী ও আভরণ, বস্তুতঃ তাদের ভঙ্গিত্ব ও আভরণত্ব হচ্ছে কাব্যের রসের সম্পর্কে। যেমন অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'উপমা কাব্যের বাচ্যার্থকেই অলংকৃত করে, কিন্তু বাচ্যার্থের তাই হচ্ছে অলংকার, যা তাকে ব্যঙ্গ্যার্থের অভিব্যঞ্জনার সামর্থ্য দেয়। সুতরাং প্রকৃতপক্ষে কাব্যের আত্মা অর্থাৎ তার রসধ্বনিই হচ্ছে অলংকার্য। কটক-কেয়ূরাদি যে শরীরে পরানো হয়, তাতেও নিজের চিত্তবৃত্তিবিশেষের ঔচিত্যসূচক ব'লে চেতন আত্মাই অলংকৃত হয়। সেইজন্যই চেতনাহীন শবশরীর কুণ্ডলাদির যোগে শোভাপ্রাপ্ত হয় না। কারণ, সেখানে অলংকার্য বস্তুর অভাব। গৃহত্যাগী যতির শরীরে কটকাদি অলংকার শোভা নয়, হাস্যাবহ। কারণ, সেখানে অলংকরণের ঔচিত্যের অভাব। কিন্তু দেহের তো ঔচিত্য-অনৌচিত্য কিছু নেই, সুতরাং বস্তুতঃ আত্মাই হচ্ছে অলংকার্য।'

> উপময়া যদ্যপি বাচ্যোঽর্থোঽলংক্রিয়তে তথাপি তস্য তদেবালংকরণং যদ্ব্যঙ্গ্যার্থাভিব্যঞ্জনসামর্থ্যাধানমিতি। বস্তুতো ধ্বন্যাত্মৈবালংকার্যঃ। কটক-কেয়ূরাদিভিরপি হি শরীরসমবায়িভিশ্চেতন আত্মৈব তত্তচ্চিত্তবৃত্তি-বিশেষৌচিত্যসূচনাত্মতয়ালংক্রিয়তে। তথাহ্যচেতনং শবশরীরং কুণ্ডলাদ্যুপেতমপি ন ভাতি। অলংকার্যস্যাভাবাৎ। যতিশরীরং কটকাদিযুক্তং হাস্যাবহং ভবতি। অলংকার্যস্যানৌচিত্যাৎ। ন চ দেহস্য কিংচিদনৌচিত্যমিতি বস্তুত আত্মৈবালংকার্যঃ।[১]

অর্থাৎ, কাব্যের যা কিছু, তার একমাত্র মাপকাঠি কাব্যের রস। কাব্যের 'গুণ' অর্থে, যা তার রসকে উৎকর্ষ দেয়; কাব্যের 'দোষ' আর কিছু নয়, যা তার রসের লাঘব ঘটায়। কাব্যের ভাষা, বাচ্য, রীতি ও অলংকারের যে দোষগুণ বলা হয়, সেটা উপচার মাত্র।

> অপি ত্বাত্মভূতস্য রসস্যৈব পরমার্থতো গুণা মাধুর্যাদয়ঃ, উপচারেণ তু শব্দার্থয়োঃ।[২]

১ ধ্বন্যালোকলোচন, ২।৬ ২ অভিনবগুপ্ত

'মাধুর্য প্রভৃতি যে গুণ, তা পরমার্থতঃ কাব্যের আত্মাস্বরূপ রসেরই গুণ। শুধু ব্যবহারিক ভাবে তাদের শব্দ ও অর্থের গুণ বলা হয়।'

সুতরাং কাব্যের ভাষা, রীতি বা অলংকারের কোনো বাঁধাবাঁধি নিয়ম অসম্ভব। কেননা, রস ছাড়া এদের আর কোনো নিয়ামক নেই। পূর্বতন কবিদের কাব্যপরীক্ষায় যদি তাঁদের ব্যবহার থেকে কোনো সাধারণ নিয়ম আবিষ্কারও করা যায়, নবীন কবির কাব্যপ্রতিভা হয়তো সম্পূর্ণ ভিন্ন নিয়মে চ'লে সমান রসোদ্‌বোধক কাব্যের সৃষ্টি করবে। কাব্যের বাচ্য বা বিষয় সম্বন্ধেও ঐ এক কথা। কোন্ শ্রেণীর বিষয়কে অবলম্বন করে কবি তার কাব্য রচনা করবে, তার গণ্ডি এঁকে দেওয়া সম্ভব নয়। কবির প্রতিভা, অভিনবগুপ্ত যাকে বলেছেন 'অপূর্ববস্তু-নির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা', সে যে কোন্ অপূর্ব কথাবস্তুর সৃষ্টি ক'রে রসকে আকর্ষণ করবে, আগে থেকে কে তা নির্ণয় করতে পারে। সেইজন্য আনন্দবর্ধন বলেছেন,

তস্মান্নাস্ত্যেব তদ্বস্তু যৎ সর্বাত্মনা রসতাৎপর্যবতঃ কবেস্তদিচ্ছয়া
তদভিমতরসাঙ্গতাং ন ধত্তে।[১]

'এমন বস্তু নেই, যা রসতৎপর কবির ইচ্ছায় তাঁর অভিমত প্রকাশোপযোগী অঙ্গত্ব না ধারণ করে।' কারণ,

অপারে কাব্যসংসারে কবিরেব প্রজাপতিঃ।

বস্তুর জগতের মতো কাব্যের জগৎও সীমাহীন, এবং এ জগতের সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা হচ্ছেন কবি। সৃষ্টির কাজে নিজের প্রতিভার নিয়ম ছাড়া আর কোনো নিয়ম তাঁর উপর চলে না।

ব্যবহারয়তি যথেষ্টং সুকবিঃ কাব্যে স্বতন্ত্রতয়া।

কাব্যে কবির ব্যবহার স্বাধীন, কেননা, এখানে তিনি স্বতন্ত্র, বাইরের কোনো কিছুর পারতন্ত্র্য তাঁর নেই।

১ ধ্বন্যালোক, ৩।৪২-৪৩, বৃত্তি

৩

কবিকে নিজের প্রতিভার যে নিয়ম মানতে হয়, সুতরাং কাব্যবিচারের যা একমাত্র নিয়ম, আলংকারিকেরা তার নাম দিয়েছেন 'ঔচিত্য' অর্থাৎ অভিপ্রেত রসের উপযোগিত্ব।

> বাচ্যানাং বাচকানাং চ যদৌচিত্যেন যোজনম্।
> রসাদিবিষয়েণৈতৎ কর্ম মুখ্যং মহাকবেঃ ॥[১]

'মহাকবির মুখ্য কবিকর্ম হচ্ছে রসের অভিব্যঞ্জনার উপযোগী ক'রে কাব্যের বাচ্য ও বাচকের উপনিবন্ধন।' সুতরাং কাব্যের কথা ও রীতি, ছন্দ ও অলংকার, এদের বিচারের অদ্বিতীয় বিধি হচ্ছে— কাব্যের রসসৃষ্টিতে কার কতটা দান, তার বিচার করা; আলংকারিকদের ভাষায়, এদের রসের 'অনুগুণত্বে'র পরিমাণ নির্ণয় করা। এ ছাড়া আর কোনো নিক্তি এখানে অচল ও অপ্রাসঙ্গিক।

> অনৌচিত্যাদৃতে নান্যদ্রসভঙ্গস্য কারণম্।
> প্রসিদ্ধৌচিত্যবন্ধস্তু রসস্যোপনিষৎ পরা ॥[২]

'অনৌচিত্য ছাড়া কাব্যের রসভঙ্গের আর কোনো কারণ নেই। এই ঔচিত্যবন্ধই রসের উপনিষৎ, কাব্যতত্ত্বের পরা বিদ্যা।'

একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। সম্প্রতি বাংলাদেশে তর্ক উঠেছে শ্রীরামচন্দ্রকে রামায়ণ থেকে কতকাংশে ভিন্নচরিত্রের কল্পনা ক'রে চিত্রিত করবার অধিকার কোনো আধুনিক কবির আছে কি না। একদল পণ্ডিত বলছেন, ও-অধিকার নেই; কারণ, শ্রীরামচন্দ্রকে হিন্দুরা দেবতাবোধে পূজা করে; সে চরিত্রের বিকৃত অঙ্কনে হিন্দুর মনে, অর্থাৎ তাদের ধর্মভাবে, আঘাত লাগে। প্রাচীন হিন্দু আলংকারিকেরা বলতেন, কাব্যবিচারে ও-যুক্তি একেবারে অপ্রাসঙ্গিক। কাব্যের

১ ধ্বন্যালোক, ৩।৩২   ২ ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪, বৃত্তি

কোনো চিত্র বা চরিত্র কারো ধর্মবিশ্বাসে ঘা দেয় কি না, কাব্যত্বের বিচারে সে প্রসঙ্গের কোনো মূল্য বা প্রসার নেই। হতে পারে সেটা সামাজিক হিসাবে দূষ্য। এবং আঘাতপ্রাপ্ত ধর্মের ধার্মিক লোকের গায়ে জোর যদি বেশি হয়, তবে তারা কবির মুখ বন্ধ করেও দিতে পারে; যেমন রাজনৈতিক হিসাবে দূষ্য বলে রাজা কাব্যবিশেষের প্রচার বন্ধ করে দিতে পারেন। কিন্তু তা দিয়ে কাব্যের কাব্যত্বের ভালোমন্দ কিছু বিচার হয় না। এ মতকে প্রাচীন আলংকারিকদের মত বলছি, কেবল তাঁদের কাব্যবিচারের সূত্র থেকে অনুমান করে নয়। কারণ, ঠিক এই প্রশ্নই তাঁরাও তুলেছেন এবং মীমাংসা করেছেন; কেননা, আদিকবির পর বহু সংস্কৃত কবি রামচন্দ্রকে নায়ক করে কাব্য ও নাটক রচনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের তর্ক ও মীমাংসা, এ দুয়েরই ধারা নবীন বাঙালি হিন্দুর তর্ক ও মীমাংসা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রাচীন আলংকারিকদের বিচারের ফল একটি পরিকরশ্লোকে সংক্ষেপ করা আছে।

> সন্তি সিদ্ধরসপ্রখ্যা যে চ রামায়ণাদয়ঃ।
> কথাশ্রয়া ন তৈর্যোজ্যা স্বেচ্ছা রসবিরোধিনী॥[১]

'রামায়ণ প্রভৃতি যে-সব কাব্য সিদ্ধরসতুল্য, তাদের কথাতে এমন কথা যোগ করা চলে না, যা তাদের রসের বিরোধী।' সিদ্ধরস কাব্য কাকে বলে, তা অভিনবগুপ্ত বুঝিয়েছেন— সিদ্ধ আস্বাদমাত্র শেষো ন তু ভাবনীয়ো রসো যেষু—'যে কাব্যের রস রসসৃষ্টির উপায়কে অতিক্রম করে পাঠকের মনে আস্বাদমাত্রে পরিণত হয়েছে।' অর্থাৎ যে কাব্য লোকসমাজে এতই প্রচলিত ও পরিচিত যে, তার রসের আস্বাদ যেন তার কথাবস্তুনিরপেক্ষ পাঠকের মনে লেগে আছে। তার কাব্যকথা পাঠকের মনের রসের তারে যে গভীর ঘা দিয়েছে, তার বিশেষ সুর

১ ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪, বৃত্তি

পাঠকের মনে বেজেই আছে। নূতন কাব্যের কোনো কথায় যদি সে সুরের বেসুর কিছু বাজে, তবে তার রসভঙ্গ অনিবার্য। সুতরাং তেমন কথা ঔচিত্যের ব্যতিক্রম। কিন্তু এ 'ঔচিত্য' রসের ঔচিত্য— সমাজ বা ধর্মের ঔচিত্য নয়।

আধুনিক কালের আর-একটা তর্ক, 'রিয়ালিজ্‌ম্' ও 'আইডিয়া-লিজ্‌ম্', বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্রের বিবাদকে, আলংকারিকেরা ঔচিত্যের বিধি দিয়ে বিচার করেছেন। কাব্যের লক্ষ্য রস। রস ভাবের পরিণতি। কিন্তু ভাব নিরালম্ব জিনিস নয়, বস্তুকে আশ্রয় করেই জন্মায় ও বেঁচে থাকে। কবি ভাবের এই বস্তুকে কথাশরীর দিয়েই রসের উদ্বোধন করেন। সুতরাং কাব্যের কথাবস্তু যদি ভাবের প্রাকৃত বস্তুর যথাযথ চিত্র না হয়, তবে রসোদ্বোধের বাধা ঘটে। আলংকারিকেরা একে বলেছেন, 'ভাবৌচিত্য' বা 'প্রকৃত্যৌচিত্য'। আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'সেইজন্য লৌকিক মানুষ নিয়ে যে কাব্য, তাতে সপ্তার্ণবলঙ্ঘন প্রভৃতি ব্যাপারের অবতারণা বর্ণনামহিমায় সৌষ্ঠবসম্পন্ন হলেও কাব্যত্ব হিসাবে নীরস। এবং তার হেতু হচ্ছে 'অনৌচিত্য'।'

> তথা চ কেবলমানুষস্য রাজাদের্বর্ণনে সপ্তার্ণবলঙ্ঘনাদিলক্ষণা ব্যাপারা উপনিবধ্যমানাঃ সৌষ্ঠবভৃতোঽপি নীরসা এব নিয়মেন ভান্তি। তত্র ত্বনৌচিত্যমেব হেতুঃ।[১]

ব্যাখ্যায় অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'বর্ণনা এমন হবে, যেন তাতে পাঠকের প্রতীতিখণ্ডন না হয়।'

> যত্র বিনেয়ানাং প্রতীতিখণ্ডনা ন জায়তে তাদৃগ্ বর্ণনীয়ম্।

কাব্যের জগৎ বস্তুর জগৎ নয়, মায়ার জগৎ— এ কথা সত্য। কিন্তু বস্তুনিরপেক্ষ মায়া হয় না; সুতরাং সম্পূর্ণ অবাস্তব কাব্য অসম্ভব। এবং কাব্যের কথাবস্তুর বস্তুপরতার লাঘব যদি তার রস-আকর্ষণ-

১ ধ্বন্যালোক, ৩।১০-১৪, বৃত্তি

শক্তির হীনতা ঘটায়, তবে সে লাঘব কাব্যের দোষ। কিন্তু কথা-বস্তুর লক্ষ্য বস্তু নয়, রস। কাব্য যে বস্তুকে চিত্রিত করে, সে তার বাস্তবতার জন্য নয়, রসাভিব্যক্তির জন্য। কাজেই উপায় যদি উদ্দেশ্যকে ছাপিয়ে যায়, তবে ঠিক বিপরীত অনৌচিত্যের দোষে কাব্যের রসভঙ্গ হয়। বস্তুর বাস্তবতা অনন্ত। কোনো কবিই তার সবটাকে কাব্যের কথাবস্তুতে স্থান দিতে পারেন না। যদি পারতেন, তবে ফলে যা সৃষ্টি হত, তা আর যাই হোক— কাব্য নয়। সুতরাং ঐ বাস্তবতার কতটা কোন্ কাব্যে স্থান পাবে, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে সেই কাব্যের উদ্দিষ্ট রসের উপর, ও কবির প্রতিভার প্রকৃতির উপর। বস্তুর বাস্তবতার যে অংশ কাব্যের রসকে অভিব্যঞ্জিত বা পরিপুষ্ট না করে, সে অংশ কাব্যের অঙ্গ নয়, কাব্যের বোঝা। আলংকারিকেরা বলেছেন,

যস্মিন্ রসো বা ভাবো বা তাৎপর্যেণ প্রকাশ্যতে।
সংবৃত্যাভিহিতং বস্তু যত্রালংকার এব বা ॥[১]

'শ্রেষ্ঠ কাব্যের রসই প্রধান হয়ে ব্যক্ত হয়, তার বস্তু ও অলংকার যেন গোপন থাকে।' অর্থাৎ, আলংকারিকদের মতে, কাব্যে অলংকারের আতিশয্য ও বাস্তবতার আতিশয্য একই শ্রেণীর দোষ। কারণ, দুই আতিশয্যই উদ্দিষ্ট রসকে প্রধান না করে, উপায়কেই প্রধান করে তোলে।

বস্তুতন্ত্র ও ভাবতন্ত্র রসসৃষ্টির দুই ভিন্ন কৌশল। কোন্ কবি কোন্ কাব্যকৌশল অবলম্বন করবেন, তা নির্ভর করে তাঁর প্রতিভার বিশেষত্বের উপর।

কবিস্বভাবভেদনিবন্ধনত্বেন কাব্যপ্রস্থানভেদঃ।[২]

'কবি প্রতিভার স্বভাবের ভিন্নত্বের ফলেই কাব্যের প্রস্থান বা রীতির ভেদ হয়।' এই দুই কৌশলের সৃষ্ট রসের মধ্যে আস্বাদের প্রভেদ

১ ধ্বন্যালোক, ৩।৪২-৪৩, বৃত্তি   ২ বক্রোক্তি-জীবিত ১।২৪, বৃত্তি

আছে, কিন্তু রসত্বের প্রভেদ নেই। সুতরাং কেউ কাউকেও কাব্যের জগৎ থেকে নির্বাসন দেবার অধিকারী নয়। এক আস্বাদের রসভোগে অরুচি হলে, হয়তো কিছুদিন কাব্যপাঠকের অন্য আস্বাদের রসে একান্ত রুচি দেখা যায়। এই রুচি-পরিবর্তন দিয়ে কাব্যের কাব্যত্ব বিচার হয় না। শকুন্তলার বিদূষক বলেছিল, পিণ্ডখর্জুরে অরুচি হলে তেঁতুলের দিকে রুচি যায়।

ফল

হেল্‌ম্‌হোলৎস্‌ আবিষ্কার করেছিলেন যে, মানুষের চক্ষু, যাকে লোকে প্রকৃতির সৃষ্টিকৌশলের একটা চূড়ান্ত উদাহরণ মনে করে, সেটি যন্ত্রহিসাবে দোষ ও ত্রুটিতে ভরপুর। আলোকরশ্মিকে গুছিয়ে এনে রেটিনার পর্দায় ছায়া ফেলার জন্য চোখের যে সামনে-পিছনে উপরে-নিচে ডাইনে-বাঁয়ে গতি আছে, তার সীমা অতি সামান্য। ফলে একটু বেশি দূরের জিনিসও দৃষ্টির বাইরে থাকে, একটু বেশি কাছের জিনিসও দেখা যায় না। চোখকে তাজা রাখার জন্য যে-সব নাড়ী তাতে রক্ত সরবরাহ করে, তারাই আবার অবিচ্ছিন্ন আলো প্রবেশের বাধা। দু-চোখের দৃষ্টি যাতে দু-মুখো না হয়ে একমুখীন হয়, তার যন্ত্রপাতির মধ্যেও নানা গলদ। মোটের উপর এরকম একটা বৈজ্ঞানিক যন্ত্র যদি কেউ হেল্‌ম্‌হোলৎস্‌কে বেচতে আসত, তবে কেনা দূরে থাক্‌, তিনি তাকে বেশ কড়া দু-কথা শুনিয়ে দিতেন। কিন্তু এ-সব সত্ত্বেও মানুষের চোখ মানুষের অমূল্য সম্পদ। কারণ, তার নিত্য ঘরকন্নার কাজ ওতেই বেশ চলে যায়; ও-সব দোষত্রুটিতে কোনো বাধা হয় না। কেননা, সেগুলি ধরা পড়ে বীক্ষণে নয়, অণুবীক্ষণে। চোখের মতো কাব্যকেও সমালোচনার 'অপ্‌থাল্‌মস্‌কোপ্‌' দিয়ে দেখলে শ্রেষ্ঠ কাব্যেও নানা দোষত্রুটি আবিষ্কার করা যায়। বিশ্বনাথ বলেছেন, 'নির্দোষ না হলে যদি কাব্য না হত, তবে কাব্যপদার্থটি হত অতি বিরল, এমন কি নির্বিষয়; কারণ, সর্ব রকমে নির্দোষ কাব্য একান্ত অসম্ভব।'[১]

কিন্তু চোখের কাজ যেমন নির্দোষ বৈজ্ঞানিক যন্ত্র হওয়া নয়,

১ এবং কাব্যং প্রবিরলবিষয়ং নির্বিষয়ং বা স্যাৎ। সর্বথা নির্দোষস্যৈকান্তমসম্ভবাৎ।
—সাহিত্যদর্পণ

মানুষকে রূপের জ্ঞান দেওয়া, কাব্যের কাজ তেমনি দোষহীন শব্দার্থের রচনা নয়, রসের সৃষ্টি করা। সুতরাং দোষত্রুটি সত্ত্বেও যে প্রবন্ধ রসসৃষ্টিতে সফল, তা কাব্য; আর সেখানে যা নিষ্ফল, তার রচনার দোষগুণ কাব্যের দোষগুণ নয়, কারণ কাব্যত্বই সেখানে নেই। আনন্দবর্ধন কাব্যের দোষ দু-ভাগে ভাগ করে কথাটা বিশদ করেছেন। দ্বিবিধো হি দোষঃ— কবেরব্যুৎপত্তিকৃতোঽশক্তিকৃতশ্চ।[১] 'কাব্যের দোষ দু-রকমের— কবির অব্যুৎপত্তিকৃত ও কবির অশক্তি-জনিত। ছোটোখাটো অসংগতি ও অনৌচিত্য, ভাষার কাঠিন্য, ছন্দের অলালিত্য— কবির অব্যুৎপত্তিকৃত এ-সব দোষ কাব্যের পক্ষে মারাত্মক নয়। কারণ,

> অব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্ত্যা সংব্রিয়তে কবেঃ।
> যস্ত্বশক্তিকৃতস্তস্য স ঝটিত্যবভাসতে ॥[২]

'অব্যুৎপত্তিকৃত যে দোষ, কবির রসসৃষ্টির শক্তি তাদের সংবরণ করে রাখে। অর্থাৎ শক্তি তিরস্কৃত হয়ে তারা এক রকম অলক্ষ্যই থেকে যায়।[৩] কিন্তু কাব্যের দোষের মূল হচ্ছে কবির রসসৃষ্টিশক্তির লাঘবতা, সহৃদয় পাঠকের চিত্তে সে দোষ মুহূর্তেই প্রতিভাত হয়।' এবং এই দোষই কাব্যের যথার্থ দোষ। নইলে 'ব্যুৎপত্তি'র— অভিনবগুপ্ত যাকে বলেছেন, তদুপযোগিসমস্তবস্তুপৌর্বাপর্যপরামর্শকৌশলম্, কাব্যের সমস্ত বস্তু উদ্দিষ্ট রসের উপযোগী কি না, তার পৌর্বাপর্য বিচার ক'রে প্রয়োগ-কৌশল— তার অভাব মহাকবিদের কাব্যপ্রবন্ধেও মাঝে মাঝে দেখা যায়; কিন্তু, যেমন অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'এমনি তাদের কবিপ্রতিভা যে, তাদের কাব্যের প্রতি বর্ণিত বিষয় চিত্তকে সেখানেই বন্দী করে রাখে, পৌর্বাপর্য বিচারের অবসর দেয় না। কেমন, যেমন

১ ধ্বন্যালোক, ৩।৬ ২ ধ্বন্যালোক, ৩।৬, বৃত্তি

৩ তত্রাব্যুৎপত্তিকৃতো দোষঃ শক্তিতিরস্কৃতত্বাৎ কদাচিন্ন লক্ষ্যতে।— ধ্বন্যালোক, ৩।৬

অতি পরাক্রমশালী পুরুষের অনুচিত বিষয়েও যুদ্ধের বিক্রম দেখে সাধুবাদ দিতে হয়, পৌর্বাপর্যবিচারের দিকে মন থাকে না।'[১] বিপুল রসনিস্যন্দী, এবং প্রতি কাব্যাঙ্গ সে রসকে উপচিত ও প্রগাঢ় করছে, এমন কাব্য খুব বেশি সৃষ্টি হয় নি। সেইজন্য আনন্দবর্ধন বলেছেন, 'কাব্যের সংসার অতি বিচিত্র কবিপরম্পরাবাহিনী বটে ; কিন্তু মহাকবি বলতে কালিদাস প্রভৃতি দু' তিন পাঁচ জনকেই গণনা করা চলে।'[২] সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্বসাহিত্যের দিকে তাকালেও আনন্দবর্ধনের কথা বেশি বদল করতে হয় না। কালিদাস যখন বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টিপ্রবৃত্তিকে সমগ্রবিধ গুণের পরাঙ্মুখী বলেছিলেন, তখন কবিপ্রতিভার সৃষ্টির কথাও নিশ্চয় তাঁর মনে ছিল।

কাব্যের সঙ্গে কাব্যের বড়ো-ছোটোর যে ভেদ, সে ভেদ রসের তারতম্য নিয়ে। কাব্য ও অকাব্যের প্রভেদ সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। কাব্যের রসসৃষ্টির যা সব উপকরণ— কথা, ভাষা, অলংকার, ছন্দ— সেই মালমসলা দিয়ে যে রচনা অথচ কাব্যের আত্মা 'রস' যাতে নেই, তাই হচ্ছে 'অকাব্য'। আলংকারিকেরা এ শ্রেণীর রচনার নাম দিয়েছেন 'চিত্রকাব্য'। চিত্র যেমন বস্তুর অনুকরণ, কিন্তু বস্তু নয়, এও তেমনি কাব্যের অনুকরণ, কিন্তু কাব্য নয়।[৩] এ রকম অকাব্য বা চিত্রকাব্যের যে রচনা হয়, তার নানা কারণ। প্রধান কারণ, রসসৃষ্টির প্রতিভা যার নেই, তার কাব্যরচনার ইচ্ছা। এই ইচ্ছার বেগে যা রচনা করা চলে, তা স্বভাবতঃই কাব্য হয় না, হয় কাব্যের

১ …অসৌ বর্ণিতস্তথা প্রতিভানবতা কবিনা যথা তত্রৈব বিশ্রান্তং হৃদয়ং পৌর্বাপর্যপরামর্শং কর্তুং ন দদাতি। যথা নির্ব্যাজপরাক্রমস্য পুরুষস্যাবিষয়েঽপি যুধ্যমানস্য তাবত্তস্মিন্নবসরে সাধুবাদো বিতীর্যতে ন তু পৌর্বাপর্যপরামর্শো তথাত্রাপীতি ভাবঃ।—অভিনবগুপ্ত, ধ্বন্যালোকলোচন, ৩।৬

২ অস্মিন্নতিবিচিত্র-কবিপরম্পরা-বাহিনী সংসারে কালিদাস-প্রভৃতয়ো দ্বিত্রাঃ পঞ্চষা বা মহাকবয় ইতি গণ্যন্তে।—ধ্বন্যালোক, ১।৬

৩ কেবলবাচ্যবাচকবৈচিত্র্যমাত্রাশ্রয়েণোপনিবদ্ধমালেখ্যপ্রখ্যং যদা ভাসতে তচ্চিত্রম্। ন তন্মুখ্যং কাব্যম্। কাব্যানুকারো হ্যসৌ।—ধ্বন্যালোক, ৩।৪২,৪৩

বাহ্যিক মূর্তি মাত্র। এইজন্যই প্রতিভাশালী কবির অকবি সমসাময়িক কবিযশঃপ্রার্থীরা তাঁর ভাষা, ছন্দ ও ভঙ্গির যথাসাধ্য অনুকরণ করে থাকে। কারণ, কাব্যরসের ঐ মূর্তিই তখন তাদের চোখের সামনে সবচেয়ে দেদীপ্যমান। এবং তাদের মনের ভরসা এই যে, কতকটা ঐ রকমের মূর্তি গড়তে পারলেই, তার মধ্যে প্রাণ আপনি এসে যাবে। আনন্দবর্ধন লিখেছেন যে, রসতৎপরতাশূন্য বিশৃঙ্খলবাক্ লেখকদের কাব্যরচনার প্রবৃত্তি দেখে তিনি 'চিত্রকাব্য' নামটির পরিকল্পনা করেছেন।[১] কিন্তু আনন্দবর্ধন এ শ্রেণীর লেখকদের উপর অবিচার করেন নি। সূক্ষ্ম বিচার করে এদের যেটুকু পাওনা, তা তাদের দিয়েছেন। এদের রচনাকে যে নীরস বলা হয়, তার অর্থ এ নয় যে রস তাতে একেবারেই নেই; কারণ, বস্তুসংস্পর্শহীন রচনা হয় না। এবং জগতের সব বস্তুই কোনো-না-কোনো রসের অঙ্গত্ব ধারণ করতে পারে। রস হচ্ছে বিভাবজনিত চিত্তবৃত্তিবিশেষ। এমন কোনো বস্তু নেই যা কাব্যের আকারে গ্রথিত হলে কিছু না কিছু এ রকম চিত্তবৃত্তির জন্ম দেয় না। যদি থাকে, তবে সে বস্তুকে চিত্রকাব্যের লেখকেরাও তাদের রচনার বিষয় করে না।[২] কিন্তু অকবির কাব্যাকার বাচ্যসামর্থ্যবশে যে রসের সৃষ্টি হয়, তার প্রতীতি অতি দুর্বল। এবং এই দুর্বল রসরচনাকেই নীরস চিত্রকাব্য বলা হয়।

> বাচ্যসামর্থ্যবশেন···তথাবিধে বিষয়ে রসাদিপ্রতীতির্ভবন্তী পরিদুর্বলা ভবতীত্যনেনাপি প্রকারেণ নীরসত্বং পরিকল্প্য চিত্র-বিষয়ো ব্যবস্থাপ্যতে।

১ এতচ্চ চিত্রং কবীনাং বিশৃঙ্খলগিরাং রসাদিতাৎপর্যমনপেক্ষ্যৈব কাব্যপ্রবৃত্তিদর্শনাদস্মাভিঃ পরিকল্পিতম্।—ধ্বন্যালোক

২ যস্মাদবস্তুসংস্পর্শিতা কাব্যস্য নোপপদ্যতে। বস্তু চ সর্বমেব জগদ্গতমবশ্যং কস্যচিদ্রসস্য চাঙ্গত্বং প্রতিপদ্যতে। বিভাবত্বেন চিত্তবৃত্তিবিশেষা হি রসাদয়ঃ; ন চ তদস্তি বস্তু কিংচিৎ যন্ন চিত্তবৃত্তিবিশেষমুপজনয়তি, তদনুৎপাদনে বা কবিবিষয়তৈব তস্য ন স্যাৎ।—ধ্বন্যালোক

অর্থাৎ, যে কোনো রস যা কিছু পরিমাণে থাকলেই কাব্য হয় না। সহৃদয় কাব্যরসিকের চিত্তের রসপ্রতীতির প্রথম ধাপেও যা না পৌঁছে, তা কাব্য নয়, চিত্রকাব্য।

শক্তিহীন লেখকের রসসৃষ্টির প্রয়াস চিত্রকাব্য রচনার একমাত্র কারণ নয়। অনেক নিবন্ধ কাব্যের আকার দিয়ে লেখা হয়, রসসৃষ্টি যাদের লক্ষ্যই নয়। যাদের উদ্দেশ্য উপদেশ দেওয়া, প্রচার করা, মানুষের বুদ্ধির কাছে কোনো সত্যকে প্রকাশ করা। যেমন পোপের 'এসে অন্ ম্যান,' কি, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের 'সদ্ভাবশতক'। এ-সব রচনাকে কাব্যের আকারে গড়াতে এদের মধ্যে যে দুর্বল রসাভাসের সৃষ্টি হয়, তার উদ্দেশ্য বাচ্য বা বক্তব্যকে কিঞ্চিৎ সরস করা মাত্র। রস এখানে উপায়, বক্তব্যই লক্ষ্য। মহাকবিরাও খেলাচ্ছলে মাঝে মাঝে এ রকম চিত্রকাব্য রচনা করেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'।

কানাকড়ি পিঠ তুলে কহে টাকাটিকে,
তুমি ষোলো আনা মাত্র, নহ পাঁচসিকে।
টাকা কয়, আমি তাই, মূল্য মোর যথা—
তোমার যা মূল্য তার ঢের বেশি কথা।

এর যা আবেদন, তা মানুষের চিত্তের কাছে নয়, মানুষের বুদ্ধির কাছে। কেবল বক্তব্যের চমৎকারিত্বে ও বাক্যের নিপুণতায় একে কাব্য বলে ভ্রম হয়। কিন্তু কবি যখন লিখলেন

প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোটো ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ করে তারে কাননে সবাই—
সূর্য উঠি বলে তারে, ভালো আছ ভাই?

তখন বাচ্য স্পষ্টই বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে রসের ধ্বনিতে চিত্তকে ঘা দিলে। অকবির কাব্যসৃষ্টির প্রয়াস চিত্রকাব্যের রচনা করে। মহাকবির চিত্রকাব্য নিয়ে খেলাও কাব্য হয়ে ওঠে।

২

রসের জোগান যথেষ্ট না থাকলে কাব্য হয় না, সে কথা ঠিক, কিন্তু রস কি কাব্যের চরম লক্ষ্য। অনেক লোকের মন এ কথায় সায় দেয় না। তাঁরা বলেন, শ্রেষ্ঠ কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব কেবল তার রসের ব্যাপকতা ও গভীরতায় নয়; ঐ রসসৃষ্টির ভিতর দিয়ে কবি যে মহত্তর ও বৃহত্তর জিনিস মানুষকে দান করেন, তারই মধ্যে। সে জিনিস কী, সে সম্বন্ধে মতের ঠিক ঐক্য নেই। কেউ বলেন, কবি রসের তুলিতে মঙ্গলকে মানুষের চিত্তে এঁকে দেন; কেউ বলেন, কবি সত্যকে রসের মূর্তিতে প্রকাশ করেন। তবে এ-সব মতেরই মনের কথা এই যে, রসবস্তুটির নিজের ওজন খুব বেশি নয়। এবং ঐ হালকা জিনিসই যদি কাব্যের চরম বস্তু হত, তবে কাব্য হত ছেলেখেলা, জ্ঞানীর উপাদেয় নয়। অর্থাৎ কাব্যের সুন্দরের আড়ালে সত্য ও শিব আছে বলেই কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব।

সভ্যতার সকল সৃষ্টিই সম্ভব হয়েছে, সমাজবন্ধন মানুষকে পশুত্ব থেকে যে মুক্তি দিয়েছে, সেই মুক্তির জোরে। মানুষের কতকগুলি চিত্তবৃত্তির বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উপর সমাজের স্থিতি ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে। কাব্যরসের মধ্য দিয়ে যাঁরা মঙ্গলকে চান, একটু পরীক্ষা করলেই দেখা যাবে, তাঁরা চান যেন কাব্য এইসব সামাজিক চিত্তবৃত্তিগুলির দিকে পাঠকের মনকে অনুকূল করে। কাব্যের কাছে সভ্যতার মূল ভিত্তির এই দাবি আলংকারিকেরা একেবারে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাঁরা কাব্যরসকে 'লোকোত্তর' বলেছেন সত্য, কিন্তু এই অলৌকিক বস্তু লৌকিক জগতের কোনো হিতেই লাগে না, সমাজের বুকে থেকে এত বড়ো অসামাজিক কথা সোজাসুজি প্রচার করা তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন নি। সুতরাং তাঁদের গ্রন্থারম্ভে অনেক আলংকারিক প্রমাণ করেছেন যে, কাব্য থেকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,

চতুর্বর্গ ফলপ্রাপ্তি হয়।[১] কাব্য কবিকে যশ ও অর্থ, সুতরাং সকল কাম্যবস্তু দান করে। কাব্যে যে-সব দেবতাস্তুতি থাকে, তারা ধর্মের সহায়, আর ধর্মের শেষ ফল মোক্ষ। কাব্য লোককে কৃত্যে প্রবৃত্তি ও অকৃত্যে নিবৃত্তি দেয়। কাব্য পাঠককে উপদেশ করে, রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবৎ, রামের মতো পিতৃসত্য পালনের জন্য বনে যাওয়া উচিত, রাবণের মতো পরদারহরণ অনুচিত।[২] তবে এ উপদেশ নীরস শাস্ত্রবাক্যের উপদেশ নয়, কান্তাসম্মিততয়োপদেশ-যুজে[৩]— কান্তার উপদেশের মতো সরস, অর্থাৎ অম্লমধুর উপদেশ।

কাব্যরসের এই ফলশ্রুতি যে আলংকারিকদের মনের কথা নয়, সমাজ ও সামাজিক লোকের সঙ্গে মুখের আপসের কথা, তার প্রমাণ, ও-সব কথা তাঁদের গ্রন্থারম্ভেই আছে, গ্রন্থের আলোচনার মধ্যে তাদের লেশমাত্রেরও খোঁজ পাওয়া যায় না। সেখানে তাঁরা বলেন,

বাগ্ধেনুর্দুগ্ধ এতং হি রসং যদ্বালতৃষ্ণয়া
তেন নাস্য সমঃ স স্যাদ্দুহ্যতে যোগিভির্হি যঃ ॥[৪]

'কাব্যের বাগ্‌ধেনু থেকে যে রসদুগ্ধ ক্ষরিত হয়, যোগীরা যে তত্ত্বরস দোহন করেন, সেও তার সমান নয়।' অভিনবগুপ্ত রসের আস্বাদকে বলেছেন, পরব্রহ্মাস্বাদসচিবঃ[৫]— 'পরব্রহ্মের আস্বাদের তুল্য আস্বাদ।' রসের স্বরূপ বলতে গিয়ে আলংকারিকেরা বলেছেন,

সত্ত্বোদ্রেকাদখণ্ডস্বপ্রকাশানন্দচিন্ময়ঃ।
বেদ্যান্তরস্পর্শশূন্যো ব্রহ্মাস্বাদসহোদরঃ ॥[৬]

'রস এক ঘন আনন্দস্বরূপ চেতনা; কোনো বিষয়ান্তরের সংস্পর্শে

১ চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তিঃ সুখাদল্পধিয়ামপি। কাব্যাদেব যতস্তেন তৎস্বরূপং নিরূপ্যতে॥— সাহিত্যদর্পণ, ১।২

২ চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির্হি কাব্যতো রামাদিবৎ প্রবর্তিতব্যং ন রাবণাদিবদিত্যাদিকৃত্যাকৃত্যপ্রবৃত্তি-নিবৃত্ত্যুপদেশদ্বারেণ সুপ্রতীতৈব।— সাহিত্যদর্পণ, ১।২

৩ কাব্যপ্রকাশ ৪ ভট্টনায়ক ৫ ধ্বন্যালোকলোচন, ২।৪ ৬ সাহিত্যদর্পণ

এর প্রবাহ বিচ্ছিন্ন নয়; যে রজঃ মানুষের কামনা ও কর্মপ্রবৃত্তির মূল, যে তমঃ তার চিত্তকে লোভ ও মোহে বদ্ধ ও আবৃত রাখে— তাদের সম্পূর্ণ অভিভূত ক'রে সত্ত্বরূপে এর আবির্ভাব হয়। সুতরাং এর আস্বাদ ব্রহ্মের আস্বাদের সহোদর।'

বলা বাহুল্য, উপনিষদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের বর্ণনার অনুকরণে আলংকারিকেরা রসের আস্বাদের এই বর্ণনা করেছেন। তাঁরা যে কাব্যরসিকের রসের আস্বাদকে যোগীর পরব্রহ্মসাক্ষাৎকারের তুল্য বলেছেন, তার অর্থ শুধু এই নয় যে, রস অতি শ্রেষ্ঠ বস্তু। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের আর কোনো অন্য ফল নেই। ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভে কী লাভ হয়— এটা প্রশ্ন নয়, প্রলাপ। কারণ, আত্মলাভান্ন পরং বিদ্যতে— আত্মলাভের পর আর কিছু নেই। পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ— পরমপুরুষের সাক্ষাৎকারের পর কিছুই নেই, সীমার সেখানে শেষ, গতির সেখানে নিবৃত্তি। এই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের সঙ্গে রসের আস্বাদের তুলনা ক'রে আলংকারিকেরা এই কথাই প্রকাশ করেছেন যে, রসের শ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ান্তরনিরপেক্ষ। আর কোনো কিছুর উপায় হিসাবে রসের মূল্য নয়। যেমন ব্রহ্ম সম্বন্ধে, তেমনি রসের সম্বন্ধে 'ততঃ কিম্' এ প্রশ্ন অর্থহীন। ব্রহ্মসাক্ষাৎলাভে মানুষের সামাজিক জীবনের উপকার কী হয়, এ অনুসন্ধানও যেমন, কাব্য সংসার ও সমাজের কতটা কাজে লাগে, এ জিজ্ঞাসাও তেমনি। কাব্যকে উপদেষ্টার পদে দাঁড় না করিয়ে যাঁরা তার মূল্য দেখতে পান না, 'দশরূপকে'র সাহসী লেখক তাঁদের বলেছেন, 'অল্পবুদ্ধি সাধুলোক'।

আনন্দনিস্যন্দিষু রূপকেষু
ব্যুৎপত্তিমাত্রং ফলমল্পবুদ্ধিঃ।
যোঽপীতিহাসাদিবদাহ সাধুঃ
তস্মৈ নমঃ স্বাদপরাঙ্মুখায়॥[১]

১ দশরূপ, ১।৬

'আনন্দনিস্যন্দী নাট্যের ফলও যাঁরা ইতিহাস প্রভৃতির মতো সাংসারিক জ্ঞানের ব্যুৎপত্তি মাত্র বলেন, সেইসব অল্পবুদ্ধি সাধুদের নমস্কার। রসের আস্বাদ কী, তা তাঁরা জানেন না।'

৩

আজকের দিনের মানুষের কাছে সমাজবন্ধন ও সমাজব্যবস্থা খুব বড়ো হয়ে উঠেছে। এত বড়ো, যেন মনে হয়, মানুষের সমস্ত চেষ্টা ও সব সৃষ্টির ঐ হচ্ছে চরম লক্ষ্য। যে সৃষ্টি ঐ বন্ধন ও ব্যবস্থার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কোনো কাজে লাগে না, তার যে কোনো মূল্য আছে, সে কথা ভাবা অনেকের পক্ষে কঠিন হয়েছে। এ মনোভাব খুব প্রাচীন নয়। গত শ-দেড়েক বছর হল পশ্চিম-ইউরোপের লোকেরা কতকগুলি কল-কৌশলকে আয়ত্ত করে মানুষের নিত্য ঘরকন্না ও সমাজব্যবস্থার যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটিয়েছে— তাতেই এ মনোভাবের জন্ম। এর আশ্চর্য সফলতায় সমাজ ও জীবন যাত্রার কাম্য থেকে কাম্যতর পরিবর্তনের এক অবাধ ও সীমাহীন আদর্শের ছবি মানুষের চোখের সামনে ফুটে উঠেছে। লোকের ভরসা হয়েছে, এই পরিবর্তনশীল সমাজব্যবস্থা এক দিন, এবং সেদিন খুব দূর নয়, সমস্ত মানুষকে দুঃখলেশহীন সকল রকম সুখসৌভাগ্যের অধিকারী করে দেবে। এবং সংসার ও সমাজ থেকে মানুষের প্রাপ্তির আশা যত বেড়েছে, মানুষের 'তন্‌ মন ধন'-এর উপর এদের দাবিও তত বেড়েছে। কবির রসসৃষ্টির শক্তি এই সংসার ও সমাজের মঙ্গলে নিজেকে ব্যয় করেই সার্থক হয়, একথা আর অসংগত মনে হয় না।

প্রাচীন আলংকারিকদের সামনে আশার এই মরীচিকা ছিল না। তখনকার জ্ঞানী লোকেরা জন্মজরামৃত্যুগ্রস্ত সংসারকে মোটের উপর দুঃখময় বলেই জানতেন। একে মন্থন করে যে দু-এক পাত্র অমৃত

উঠেছে, তার অমৃতত্ব যে আবার ঐ সংসারের মঙ্গলসাধনে— একথা তাঁরা মানতে চান নি। কাব্যের রসকে তাঁরা সংসারবিষবৃক্ষের অমৃত-ফল বলেই জানতেন। আজ যদি আমরা সংসারকে দুঃখময় বলতে মনে দুঃখ পাই, তবুও একথা কী করে অস্বীকার করা যায় যে, গাছের ফলের কাজ তার মূলকে পরিপুষ্ট করা নয়। কাব্য মানুষের যে সভ্যতাবৃক্ষের ফল, তার মূল মাটি থেকে রস টানে বলেই ও-গাছ অবশ্য বেঁচে থাকে। এবং মূল যদি রস টানা বন্ধ করে, তবে ফল ধরাও নিশ্চয় বন্ধ হবে। কিন্তু নিতান্ত বুদ্ধিবিপর্যয় না ঘটলে, মূলের কাজে ফলের কতটা সহায়তা, তা দিয়ে তার দাম যাচাইয়ের কথা কেউ মনে ভাবে না। সেই ফলই কেবল গাছের পুষ্টিসাধন করে, যা মুকুলেই ঝরে যায়।

লৌকিক জীবনের উপর যে কাব্যরসের ফল নেই, তা নয়। কিন্তু সে-ফল ঐ জীবনের পুষ্টিতে নয়, তা থেকে মানুষের মুক্তিতে। লৌকিক জীবনের লৌকিকত্বকে কাব্যরসের অলৌকিক ধারায় অভিসিঞ্চিত ক'রে।

অন্তর হতে আহরি বচন
আনন্দলোক করি বিরচন,
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসারধূলিজালে।

...

ধরণীর তলে, গগনের গায়,
সাগরের জলে, অরণ্যছায়,
আরেকটুখানি নবীন আভায়
রঙিন করিয়া দিব।
সংসারমাঝে দুয়েকটি সুর
রেখে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,

দুয়েকটি কাঁটা করি দিব দূর,
তার পরে ছুটি নিব।

'পুরস্কারে'র কবির এই কবি-কথা আলংকারিকদের মনের কথা।

কিন্তু কবি তো কেবল কাব্যস্রষ্টা নন, তিনিও সামাজিক মানুষ। মানুষের যে সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা প্রণয়-হিংসা তাঁর কাব্যের বিষয়, তাদের কেবল রসসৃষ্টির উপাদানরূপে দেখা সবসময়ে তাঁর পক্ষেও সম্ভব হয় না। কবির মধ্যে যে সামাজিক মানুষ আছে, সে মানুষের সামাজিক ভালোমন্দ, আশানিরাশার বিচার থেকে কাব্যকে একেবারে নিরপেক্ষ থাকতে দেয় না। রসসৃষ্টির যেখানে চরম অভিব্যক্তি, সেখানে কবির এই সামাজিকতা ঢাকা পড়ে যায়, যেমন শেক্সপীয়রের নাটকে। যেখানে কবির সামাজিকতা প্রবল, কিন্তু রসসৃষ্টির প্রাচুর্যকে ব্যাহত করে না, সেখানে ঐ সামাজিকতাকে একটা উপরি পাওনা হিসাবে গণ্য করা চলে, যেমন টল্‌স্টয়ের 'বিগ্রহ ও শান্তি'। যেখানে উৎকট সামাজিকতাকে রসসৃষ্টির শক্তি সংবরণ করে রাখতে পারে না, সেখানে তা রসের প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে কাব্যত্বের লাঘব ঘটায়, যেমন রম্যাঁ রলাঁর 'জঁ্যা ক্রিস্‌তফ্‌'।

৪

কাব্যের কাজ যে সত্যকে সুন্দরের মূর্তি দেওয়া— এটা উনবিংশ শতাব্দীর আবিষ্কার। এবং ঐ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলির একটা গৌণ ফল। বিজ্ঞান তখন নানাদিকে যে-সব বিচিত্র সত্যের আবিষ্কার করেছে, ও তার কতকগুলিকে ঘরকন্নার কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার যে নূতন ভঙ্গি দিয়েছে— তাতে সত্য ও সত্যানুসন্ধানের উপর মানুষের অসীম শ্রদ্ধা জন্মেছে। সত্যের এই 'প্রেস্টিজ' দিয়ে সকল রকম মানসিক সৃষ্টির 'প্রেস্টিজ' বাড়ানোর ইচ্ছা খুব স্বাভাবিক

এবং ঐ ইচ্ছা কাব্যরসিকদের মগ্ন— সুতরাং মূল— চৈতন্যের মধ্যে কাজ ক'রে এই মতটির সৃষ্টি করেছে। কবি কীট্‌স্ সত্য ও সুন্দরের যে অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে এই বৈজ্ঞানিক যুগের কবি-প্রতিনিধি হিসাবে। নইলে শুদ্ধ কবির চোখ থেকে এ সত্য কিছুতেই গোপন থাকে না যে, সত্য কাব্যের লক্ষ্য নয়, কাব্যের উপাদান। বস্তুনিরপেক্ষ রস নেই, এবং বস্তুকে সত্যদৃষ্টিতে দেখার উপর রসের সৃষ্টি অনেকটা নির্ভর করে। রস ও সত্যের এই সত্যসম্বন্ধে লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটে, বৈজ্ঞানিক মায়ায়। কবি রসের ছলে উপদেশ দেন এ কথা যেমন অযথার্থ, কাব্য রসের সাজে সত্যকে প্রকাশ করে এও তেমনি অসত্য। শিল্পী তার মূর্তির মধ্য দিয়ে পাথরকে প্রকাশ করে, এ কথা কেউ বলে না। কিন্তু কবি কাব্যের মধ্য দিয়ে সত্যের বিকাশ করেন, এ কথা যে কাব্যরসিকেও বলে তার কারণ, এই বৈজ্ঞানিক যুগে 'সত্যে'র আইডিয়াকে ঘিরে মানুষের মনের 'ভাবে'র সৃষ্টি হয়েছে। এবং এই 'ভাব'কেই রসমূর্তি দিয়ে অনেক কবি কাব্য রচনা করেছেন। এ ভাব ও রস নূতন। এবং নূতনের প্রথম আবির্ভাবে তাকে মন জুড়ে বসতে দেওয়া মানুষের স্বাভাবিক মনোধর্ম।

৫

যুগে যুগে মানুষের মনে এই যে সব নূতন ভাবসৃষ্টি, কবিরা তাঁদের কাব্যে সেইসব যুগভাবকে রসে রূপান্তর করেন। মানবমনের যেগুলি চিরন্তন 'স্থায়ী ভাব', সকল যুগের কাব্যের তারাই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু যে-সব 'সঞ্চারী' কাব্যের রসকে গাঢ় করে, মানুষের বিচিত্র জীবন-প্রবাহ তাদের নব নব সৃষ্টি করে চলেছে। যুগে যুগে যে-সব 'সঞ্চারী ভাব' জন্মলাভ করে, প্রতি যুগের কাব্যরসিকের মন তাদের রসমূর্তির জন্য উন্মুখ থাকে। যে কবির কাব্যে এই নবীন ভাব নূতন রসে

পরিণত হয়, তিনিই সে যুগের 'আধুনিক' কবি। পুরাতন রসও এই নূতন অনুপানে নবত্ব লাভ করে।

কাব্যের বাণী তাতেই প্রাচীন হয়েও পুরাতন হয় না। যুগের পর যুগ রসের নূতন সৃষ্টি চলতে থাকে।

অতো হ্যন্যতমেনাপি প্রকারেণ বিভূষিতা
বাণী নবত্বমায়াতি পূর্বার্থান্বয়বত্যপি ॥[১]

'পূর্বতন কবিদের প্রাচীন বাণীও নূতন ভঙ্গিমার আভরণে নবীনত্ব লাভ করে।' জীবন যে-সব নূতন 'ভাবে'র জন্ম দিচ্ছে, তাদের রসের মূর্তি গড়ার শিল্পীর যদি অভাব না হয়, তবে নূতন কাব্যসৃষ্টিরও বিরামের আশঙ্কা নেই।

ন কাব্যার্থবিরামোঽস্তি যদি স্যাৎ প্রতিভাগুণঃ।[২]

কারণ—

বাচস্পতিসহস্রাণাং সহস্রৈরপি যত্নতঃ।
নিবদ্ধাপি ক্ষয়ং নৈতি প্রকৃতির্জগতামিব ॥[৩]

'যেমন জগৎপ্রকৃতি কল্পকল্পান্তর বিচিত্র বস্তুপ্রপঞ্চের সৃষ্টি ক'রে চলেছে, তবুও তার নূতন সৃষ্টির শেষ নেই, তেমনি সহস্র সহস্র বাণী-সম্রাট কবির রসসৃষ্টিতেও রসের নূতন সৃষ্টি শেষ হয় না, কেননা, মানবমনের 'ভাবে'র সৃষ্টির শেষ নেই।'

কিন্তু জীবন যেমন নূতন 'সঞ্চারী ভাবে'র সৃষ্টি করে, পুরাতন 'সঞ্চারী ভাবে'র তেমন ধ্বংসও করে। যে-সব ভাব মনের মৌলিক উপাদান নয়, জটিল যৌগিক সৃষ্টি— জীবনের বিশেষ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তাদের জন্ম হয়, এবং তার পরিবর্তনে এদের বিলোপ ঘটে। এরা হচ্ছে মনের 'আন্‌স্টেবল্ কম্‌পাউণ্ড'। সেইজন্য প্রাচীন কবিদের কাব্যের অনেক অংশ আমাদের মনের রসের তারে ঠিক তেমন ঘা দেয়

১ ধ্বন্যালোক, ৪।২ ২ ধ্বন্যালোক, ৪।৬ ৩ ধ্বন্যালোক, ৪।১০

না, যা তা প্রাচীনদের মনে নিশ্চয় দিত। যে ভাবের উপর সে রসের প্রতিষ্ঠা ছিল, আমাদের মন থেকে সে ভাব একবারে লোপ না হলেও ঠিক তেমনটি নেই। এ কথা কি অস্বীকার করা চলে যে, মধ্যযুগের খ্রীস্টান কাব্যরসিক দান্তের 'ডিভাইন কমিডি'তে যে রস পেতেন, এ যুগের খ্রীস্টান অখ্রীস্টান কোনো কাব্যরসিক ঠিক সে রস পান না। ও-কাব্যে যেটুকু 'স্থায়ী ভাবে'র রসে রূপান্তর, মাত্র সেইটুকুর আস্বাদই আমরা পাই। ওর যে 'সঞ্চারী'র আস্বাদ মধ্যযুগের কাব্য-পাঠকেরা পেত, তা থেকে আমরা বঞ্চিত।

যেমন প্রাচীন যুগের অনেক কাব্য আমাদের মনে আর রস জোগায় না, তেমনি আমাদের নবীন যুগের অনেক কাব্যও আমাদের যে রস দেয়, ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা তা থেকে ঠিক সে রস পাবে না। কারণ, তাদের ভাবজগৎ ঠিক আমাদের ভাবজগৎ থাকবে না। একটা চরম দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক।

মনে হল এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ;
তরুশ্রেণী চাহে, পাখা মেলি
মাটির বন্ধন ফেলি,
ওই শব্দরেখা ধ'রে চকিতে হইতে দিশাহারা,
আকাশের খুঁজিতে কিনারা।
...
শুনিতেছি আমি এই নিঃশব্দের তলে
শূন্যে জলে স্থলে
অমনি-পাখার শব্দ উদ্দাম চঞ্চল।

তৃণদল
মাটির আকাশ 'পরে ঝাপটিছে ডানা ;
মাটির আঁধার নিচে কে জানে ঠিকানা—
মেলিতেছে অঙ্কুরের পাখা
লক্ষ লক্ষ বীজের বলাকা।

এই অদ্ভুত কাব্য আধুনিক কাব্যরসিকের চিত্তের প্রতি অণুকে যে রসের আবেশে আবিষ্ট করে, তার একটা প্রধান উপাদান— 'গতি' ও 'বেগ' এ যুগের লোকের মনে যে 'ভাবে'র আবেগের সৃষ্টি করেছে। "অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা" যে আজ কবিকে "উতলা" করেছে— তার মূলে আছে এ যুগের মানুষের মনে বিশ্বপ্রকৃতির একটা বিশেষ রূপকল্পনা। এ ভাব ও কল্পনা যে মানুষের মনে চিরস্থায়ী হবে, তা মনে করার কারণ নেই। বিশ্বপ্রকৃতিকে আজ মানুষ যে চোখে দেখছে, সে দেখার যখন বদল হবে, তখন এ ভাব ও কল্পনারও বদল হবে। 'বলাকা'র "ঝঞ্ঝামদরসে মত্ত" পাখার ধ্বনিতে আমাদের চিত্তে যে রসের বিস্ময় জাগছে, সেদিনের কাব্যরসিকেরা তার অর্ধেকেরও আস্বাদ জানবে না। আমাদের অনাস্বাদিত কোন্ কাব্যরসের আস্বাদ তারা পাবে, তা নিয়ে তাদের হিংসা করব না। এ কাব্যের পূর্ণ আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হওয়ার ক্ষতি তাদের পূরণ হবে কি না, কে জানে।

পরিশিষ্ট

সাহিত্য

উপনিষদের গল্পে আছে, ব্রহ্মনিষ্ঠ ঋষি গৃহস্থাশ্রম ছেড়ে প্রব্রজ্যা নেবার ইচ্ছায় নিজের ধনসম্পত্তি তাঁর দুই পত্নীকে ভাগ করে দেবার সংকল্প জানালে এক পত্নী জিজ্ঞাসা করলেন, বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবী যদি আমি পাই, তাতে কি অমৃতত্ব লাভ করব। ঋষি উত্তর দিলেন— না, অন্য সম্পত্তিশালী লোকের মতো সুখে জীবন কাটাবে, বিত্ত দিয়ে তো কখনো অমৃতত্ব পাওয়া যায় না। মৈত্রেয়ীর বিখ্যাত প্রত্যুত্তর সকলের জানা আছে— যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্— যা দিয়ে অমৃতত্ব না পাব, তাতে আমার কী প্রয়োজন। ঋষির অন্য পত্নী কাত্যায়নী স্বামীর প্রস্তাবে কী বলেছিলেন না-বলেছিলেন, উপনিষদে তার খবর নেই। নিশ্চয় অমৃতত্ব পাওয়া যায় না ব'লে ধনসম্পত্তি তুচ্ছ, এ কথা তিনি মনে করেন নি।

যাজ্ঞবল্ক্যের দুই স্ত্রী কাত্যায়নী ও মৈত্রেয়ী মানুষের সভ্যতার দুই মূর্তির প্রতীক। পৃথিবীর অন্যসব জীবজন্তুর মতো শরীর ও মন নিয়ে মানুষ। এবং তাদের মতোই মানুষের মনের বড়ো অংশ ব্যয় হয় শরীরের প্রয়োজনে। আমরা যাকে সভ্যতা বলি, তার বেশির ভাগ, এবং অনেক সভ্যতার প্রায় সমস্তটা, শরীরের প্রয়োজন ও বিলাসের দাবি মেটাবার কৌশল। ঘরবাড়ি, পোশাকপরিচ্ছদ, অস্ত্রশস্ত্র, রেল-স্টীমার, মোটর-এরোপ্লেন, টেলিফোন-রেডিও, কলকব্জা, কৃষিবাণিজ্য— মুখ্যত এই কৌশল ছাড়া কিছু নয়। এদের আবিষ্কারে মানুষের যে বুদ্ধি অর্থাৎ মন কাজ করেছে, তার শক্তি ও জটিলতা বিস্ময়কর। কিন্তু তার লক্ষ্য সেইসব প্রেরণার লক্ষ্য থেকে ভিন্ন নয়, যাতে পাখিরা বাসা

'রংপুর সারস্বত সম্মেলনে' সভাপতির অভিভাষণ। ফাল্গুন, ১৩৩৭

বাঁধে, মাকড়সা শিকার ধরার আশ্চর্য কৌশল দেখায়, হাঁসের দল প্রতি শীতে উত্তর-ইউরোপ থেকে বাংলার পদ্মার চরে পথ না ভুলে পৌঁছে যায়। কিন্তু সভ্যতার এই কাত্যায়নী মূর্তি তার সমগ্র চেহারা নয়। পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব আজও অজ্ঞাত রহস্য। তার চেয়ে গূঢ় রহস্য প্রাণীর শরীরে মনের বিকাশ। প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টিতে মন যে পরম সহায়, এবং সে কাজে তার চেষ্টা যে ব্যাপক ও বিচিত্র — এ অতি স্পষ্ট। এবং মনকে প্রাণের যন্ত্রমাত্র কল্পনা ক'রে জটিলকে সহজবোধ্য করার প্রলোভনও স্বাভাবিক। কিন্তু এ তথ্যও স্পষ্ট যে, প্রাণের কাজে ব্যয় হয়েই মন নিঃশেষ হয় না। মানুষের এই অবশেষ মন শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে নয়, অন্য এক প্রেরণায় এক শ্রেণীর সৃষ্টি করে চলেছে, যার লক্ষ্য মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দ ছাড়া আর কিছু নয়। প্রাণ ও শরীরের যা প্রয়োজনে লাগে, তাই যদি হয় লৌকিক, মনের এ সৃষ্টি অলৌকিক। সে প্রয়োজন মেটাবার যে চেষ্টা, তাই যদি হয় কাজ, মনের এ সৃষ্টি খেলা মাত্র। লীলা নাম দিলে হয়তো ভদ্র ও গভীর শোনায়, কিন্তু স্বরূপের বদল হয় না।

খেলাই হোক আর লীলাই হোক, সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী মূর্তি তার অন্য মূর্তির মতোই স্বাভাবিক। শরীর ও প্রাণের প্রয়োজনে মানুষের মনের যে প্রকাণ্ড সৃষ্টি, তাকে যদি বিনা প্রশ্নে স্বাভাবিক বলে মেনে নেওয়া চলে, তবে মনের নিজের তৃপ্তি ও আনন্দের প্রয়োজনে তার যে সৃষ্টি, তাকেও সমান স্বাভাবিক ব'লে মেনে নিতে কোনো বাধা নেই। মনের এই খেলার বীজ পশুপক্ষীর মধ্যেও আছে। আধুনিক প্রাণি-বিজ্ঞানীদের চোখে ধরা পড়েছে পশুপক্ষীদের গতিবিধি সবই তাদের শরীরের প্রয়োজনে নয়। তাদের এমনসব চেষ্টা আছে, যার ফল কেবল মনের তৃপ্তি ও আনন্দ। পশুপক্ষীর মনের তুলনায় মানুষের মন বিরাট; সুতরাং সে মনের লৌকিক সৃষ্টিও যেমন বিশাল, অলৌকিক সৃষ্টিও তেমনি বিচিত্র।

২

আমরা যাকে সাহিত্য বলি, তা সভ্যতার এই মৈত্রেয়ী মূর্তির এক দিক্। যেমন তার অন্য নানা দিক্ ছবি, ভাস্কর্য, সংগীত, কর্মগন্ধহীন শুদ্ধ জ্ঞানের চর্চা। সাহিত্যের এই জন্মকথা স্মরণে রাখলে তার স্বরূপ ও আদর্শ নিয়ে যে-সব বিচারবিতর্ক, তার আলোচনা ও সমাধানের সুবিধা হয়। আধুনিক কালে নানা আকারে এ প্রশ্ন উঠেছে যে, সাহিত্যের কী লক্ষ্য। সামাজিক জীবনের পুষ্টি ও মঙ্গল কি তার লক্ষ্য, না তার কাজ কেবল মনকে এক রকম আনন্দ দেওয়া, যার নাম সাহিত্যিক আনন্দ। আর যদি তাই হয়, তবে সে বস্তুর মূল্য কী। প্রাচীন কালেও যে এ তর্ক ওঠে নি, তা নয়। আমাদের দেশের আলংকারিকদের একদল বলেছেন যে, কাব্যের উদ্দেশ্য লোককে কর্তব্য-অকর্তব্যের উপদেশ দেওয়া, যেমন রামায়ণ উপদেশ দেয় যে, রামের মতো হবে, রাবণের মতো নয়। কিন্তু কাব্যের উপদেশ গুরুমহাশয়ের শুষ্ক উপদেশ নয়, কান্তার উপদেশের মতো মধুর উপদেশ। আশা করা যায়, এই সৌভাগ্যবান্ আলংকারিকদের প্রিয়বাদিনী কান্তারা সব সময় মধুর বাক্যেই উপদেশ দিতেন। যা হোক, এঁদের কথা এই যে, কাব্য স্মৃতিশাস্ত্রের মতো উচিত-অনুচিত জানিয়ে দেয় না, এমন চিত্র ও চরিত্রের সৃষ্টি করে, যাতে পাঠকের মন মঙ্গলের দিকেই উন্মুখ ও অমঙ্গলের দিকে বিমুখ হয়। এবং সেই কাজই কাব্যের লক্ষ্য। এ মতকে উপহাস করে অন্য দল আলংকারিক, যেমন দশরূপকের লেখক ধনঞ্জয়, বলেছেন যে, যাঁরা অমৃতনিস্যন্দী কাব্যেও উপদেশ খোঁজেন, তাঁরা সাধুলোক, কিন্তু অল্পবুদ্ধি। অর্থাৎ কাব্যের লক্ষ্য পাঠককে কাব্য-পাঠের যে বিশেষ আনন্দ, সেই আনন্দ দেওয়া ; আর কিছু নয়।

এই মতবিরোধের আলোচনায় প্রথমেই একটি কথা মনে রাখা দরকার, যা স্বতঃসিদ্ধ, কিন্তু এ প্রসঙ্গে যা সব সময়ে মনে থাকে না। সাহিত্য কি কাব্য মতবাদীদের কল্পিত কোনো বস্তু নয়। সাহিত্যিক

ও কবির প্রতিভা যা সৃষ্টি করে, এবং সাহিত্য ও কাব্য ব'লে বিদগ্ধসমাজে যা গ্রাহ্য হয়, সেই বস্তুর প্রকৃতি ও লক্ষ্য নিয়েই আলোচনা। এ কথা মনে রেখে বিচার করলে সহজেই দেখা যায়, শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও কাব্য বলে যা স্বীকৃত, তাদের মধ্যে এমন অনেক আছে, সামাজিক মঙ্গলের লক্ষ্য যার মধ্যে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না। রামায়ণ কি মহাভারতের কবির লক্ষ্য ছিল সমাজের মঙ্গল, এ তর্ক তোলা কঠিন নয়। রঘুবংশ কি শকুন্তলায় এ লক্ষ্য আবিষ্কার করাও হয়তো অসম্ভব নয়। কিন্তু ঋতুসংহার ও মেঘদূতও তো কাব্য। ভরসা করা যায়, এ কথা কেউ বলবে না যে, যক্ষের বিরহবর্ণনায় কালিদাসের উদ্দেশ্য ছিল উপর-ওয়ালার সঙ্গে উদ্ধত ব্যবহার থেকে লোকদের নিবৃত্ত করা, এবং মেঘদূত পাঠের ফল সেই উপদেশ লাভ। কাদম্বরী কি Alice in Wonderland-এর কী উপদেশ। My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে ময়ূরের মতো নাচে রে— কোন্ উপদেশ বা মঙ্গল এদের লক্ষ্য। মোট কথা, সাহিত্য ও কাব্যের লক্ষ্য সমাজহিত, তবে খুব মনোরম ছলে, এ মত সত্যিকারের কাব্যপরীক্ষার ফল নয়; তথ্য থেকে চোখ ফিরিয়ে একটা মনগড়া তত্ত্ব।

এর উত্তরে বলা চলে যে, এগুলি ব্যতিক্রম। হিতকে মনোহারী করাই কাব্য ও সাহিত্যের লক্ষ্য। কিন্তু মনোহরণের কৌশলটা খুব সার্থক হলে তার জোরেই রচনা কাব্য ও সাহিত্য বলে চলে যায়; মধুর আধিক্যে ভিতরে যে ঔষধ নেই, সেদিকে লক্ষ্য থাকে না। এই হিতবাদ, যাদের বলে প্রাচীনপন্থী, তাদের মধ্যেই আবদ্ধ নয়। হিতবাদী যদি সামাজিক ব্যাপারে হন স্থিতির পক্ষপাতী, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম সৎ-সাহিত্য, আর তিনি যদি হন পরিবর্তন বা গতির পক্ষে, তাঁর আদর্শ সাহিত্যের নাম প্রগতি-সাহিত্য। কিন্তু স্থিতিবাদী

ও গতিবাদী সাহিত্যবিচারে দু-জনার দৃষ্টিভঙ্গী এক। যার লক্ষ্য ও ফল সামাজিক মঙ্গল নয়, তা যথার্থ শ্রেষ্ঠ সাহিত্য নয়।

সুতরাং এ প্রশ্ন তুলতেই হয়, মানুষের মনের সমস্ত চেষ্টার লক্ষ্য কেন হবে সমাজের মঙ্গলসাধন। পরীক্ষা করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক মঙ্গল প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে শেষ পর্যন্ত মানুষের শরীর ও প্রাণের রক্ষা ও পুষ্টি। শরীর ও প্রাণের প্রতি যে মায়া, আমাদের মীমাংসকদের ভাষায়, তা রাগপ্রাপ্ত— অর্থাৎ তা স্বভাবতই আছে, কোনো যুক্তি ও উপদেশের তা ফল নয়। পশুপক্ষী ও মানুষে তা সমান। এই মায়ার প্রেরণায় মানুষের মনের যা সব সৃষ্টি, তার চরম মূল্য স্বীকারে আমাদের কোনো দ্বিধা নেই। কারণ, সেই সৃষ্টিতেই মানুষের সভ্যজীবনযাপন সম্ভব হয়েছে। মনের অন্য কোনো সৃষ্টির যদি মূল্যও থাকে, এ সৃষ্টির ভিত্তি ছাড়া তা অসম্ভব। মৈত্রেয়ীকে নিয়ে বনে যাওয়া চলে, কিন্তু কাত্যায়নীকে ছেড়ে ঘরকন্না চলে না। কিন্তু মানুষের মন যে কেবল মনের তৃপ্তি ও আনন্দের জন্যই সৃষ্টি করে, এ-ও তো স্বাভাবিক; কারণ, এ রকম সৃষ্টি মানুষ করেছে ও করছে। তবে বলতে হয়, যেমন সভ্য সমাজের মঙ্গলের জন্য মানুষের অনেক স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করতে বা তাদের মুখ ঘোরাতে হয়েছে, সেই মঙ্গলের জন্যই এই আত্মতুষ্ট সাহিত্যিক প্রবৃত্তির মুখ ঘুরিয়ে শরীর ও প্রাণের হিতে তার নিয়োগ হওয়া উচিত।

এই মতকে প্রচ্ছন্ন জড়বাদ, কি দেহসর্বস্ববাদ নাম দিয়ে হেয় করার চেষ্টায় লাভ নেই। কিন্তু প্রাণের উপর স্বাভাবিক মায়ায় তার মঙ্গলের উপায়ের নিঃসংশয় মূল্যবোধ ছাড়া এ মতের অন্য কোনো ভিত্তিও নেই। সামাজিক মঙ্গল কেন কাম্য, সে প্রশ্ন এ তোলে না, মেনে নেয়। তাই কেন একমাত্র কাম্য, সে প্রশ্নও তোলে না, মেনে নেয়। অর্থাৎ উপায় নিয়ে তর্ক চলে, উদ্দেশ্য নিয়ে চলে না। কোনো-কিছু

অন্য-কিছুর সদুপায় কি না, এটা তর্কের কথা ; কারণ, প্রমাণের বিষয়। কিন্তু কোনো জিনিস তার নিজের জন্যই কাম্য কি না, এটা প্রমাণের বিষয় নয়, রুচির কথা। অন্য উদ্দেশ্যনিরপেক্ষ সাহিত্যিক আনন্দ কাম্য কি না, তা যার মন কাম্য ব'লে জেনেছে, তার কাছেই কাম্য— যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ। সে বোধ যার মনে নেই, তার কাছে প্রমাণ করা যাবে না। সাহিত্যিক আনন্দ যে সেই আনন্দে শেষ হয়েই অমূল্য, আলংকারিকদের ভাষায় মনের অনুভূতি ছাড়া তার অন্য প্রমাণ সম্ভব নয়— সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।

৩

এ আলোচনায় তর্কের মুখ যদি বন্ধ হয়, মনের সংশয় কিন্তু ঘোচে না। তার কারণ, সাহিত্যিক সৃষ্টি ও সামাজিক জীবন, সব সময়ে এদের ভেদ মনে রাখা কঠিন। লৌকিক ও সামাজিক জীবনই সাহিত্যের সৃষ্টির উপকরণ। সুতরাং সাতিত্যিক সৃষ্টি চলে লৌকিক মন ও সামাজিক জীবনের পাশাপাশি। এবং সে সৃষ্টির প্রভাব যে মন ও জীবনের উপর মাঝে মাঝে পড়বে, তা স্বাভাবিক। ভারতবর্ষের হিন্দুর সামাজিক মনের উপর রামায়ণের কাহিনী ও চরিত্রের প্রভাব অস্বীকার করা চলে না। এ যুগের শিক্ষিত বাঙালি নরনারীর মন ও সমাজের উপর রবীন্দ্রনাথের কাব্যের প্রভাব স্বীকার করতে হয়। এবং সাহিত্যিকরা কেবল সাহিত্যিক নন, তাঁরাও সামাজিক মানুষ। সমাজের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশা উপকরণরূপে তাঁদের সাহিত্যিক মনকেই কেবল উদ্‌বুদ্ধ করে না, তাঁদের সামাজিক মনকেও নাড়া দেয়। এবং এই সামাজিক মনের প্রভাব অনেক সাহিত্যে ও কাব্যে তার ছাপ রেখে যায়। যাদের মনের সাহিত্যবোধ প্রখর নয়, এবং যাদের মনের সামাজিকতা অত্যন্ত প্রখর, তারা সাহিত্যের এইসব গৌণ ফলকেই

তার মূল লক্ষ্য মনে করে ; যে সাহিত্য থেকে এই সামাজিক ফললাভের সম্ভব নেই, অবসরবিনোদনের সাহিত্য নাম দিয়ে প্রমাণ করে জিনিসটা হালকা। অবসর বস্তুটা কেন খারাপ, আর তার বিনোদন কেন দোষের, কাজের লোকের সে প্রশ্ন মনে আসে না। মার্কস্‌পন্থীরা হয়তো বলবে, নিচু শ্রেণী যাতে অসূয়া না ক'রে উঁচু শ্রেণীর জন্য ভূতের বেগার খেটে যায়, তার অনুকূলেই এ মনোভাবের সৃষ্টি।

সমাজ ও সাহিত্যের এই যোগাযোগ সাহিত্যবিচারে অনেক বিপত্তির সৃষ্টি করে। আধুনিক কালে সাহিত্যসমালোচনায় একটা কথা চলতি হয়েছে— escapism, যার বাংলা অনুবাদ হয়েছে 'পলায়নী বৃত্তি'। বর্তমান সমাজের দুঃখ দৈন্য অসংগতিতে পীড়িত হয়ে, এবং তার প্রতিকারে হতাশ হয়ে অনেক কবি ও সাহিত্যিক নাকি এমন সাহিত্য তৈরি করেছেন, মানুষের সামাজিক মন ও জীবনের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই, যার উপকরণ সম্পূর্ণ তাঁদের কল্পনা। সামাজিক জীবনের মাটি তাঁরা ছুঁচ্ছেন না, আশ্রয় নিয়েছেন কল্পনার হস্তিদন্তসৌধে, অর্থাৎ 'আইভরি টাওয়ার'-এ। এ রকম পলায়ন যে ভীরুতা, 'এস্কেপিজম্‌' নামের মধ্যে আছে সেই বিচার। কিন্তু এ বিচার কবির সামাজিক মন ও কর্তব্যবুদ্ধির বিচার, না, তাঁর কাব্যের বিচার, সব সময় বোঝা যায় না। বর্তমান কালে ভাবী সমাজের বিজয়দুন্দুভি বাজানো, কি তার তালে পা ফেলা যদি সকলের কর্তব্য হয়, তবে সেটা সামাজিক কর্তব্য, সাহিত্যিক নয়। যদিও যে বিজ্ঞানী 'রিলেটিভিটি' কি 'কোয়াণ্টাম' নিয়ে দিনরাত মেতে আছে, সে কেন কৃষির ফলন ত্রিগুণের চেষ্টা করে না, এ দোষারোপ করি নে। কারণ, প্রতিভার সৃষ্টি যা মানুষের সভ্যতাকে গড়ে তোলে, অনেক সময়েই তা নগদবিদায় নয়। 'এস্কেপিজম্‌' যদি সাহিত্যিক দোষ হয়, তবে তার কারণও সাহিত্যিক, সামাজিক নয়। লৌকিক মন ও জীবন থেকে যে সাহিত্য বিচ্ছিন্ন, তার ধারা হয় ক্ষীণ। সাহিত্যের ভাগীরথী মানুষের লৌকিক সুখদুঃখের খাত ছাড়া

বয় না। এইজন্য পৃথিবীর যা বড়ো সাহিত্য, মানুষের লৌকিক মন ও জীবন তার উপকরণ। এবং খুব বড়ো যে সাহিত্যিক সৃষ্টি, এই মন ও জীবনের বহু দিক্ ও বহু মূর্তি তার বিচিত্র উপকরণ— যেমন মহাভারতে, গ্রীক্ ট্রাজিডিতে, শেক্‌সপীয়রের নাটকে, টলস্টয়ের উপন্যাসে। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে সামাজিক জীবনের এই বিচিত্র উপকরণ-সম্ভার বিভ্রম জন্মায় যে, সাহিত্যের লক্ষ্য সমাজে ও জীবনে প্রভাব বিস্তার। সামাজিক জীবন সাহিত্যের উপকরণ সামাজিক প্রেরণায় নয়, সাহিত্যিক প্রয়োজনে। যে কবির কাব্য 'এস্কেপিস্ট', তার মূল কারণ নয় বর্তমান সমাজব্যবস্থায় কবির বিতৃষ্ণা ও হতাশা। তার কারণ, এর বিশাল ও জটিল উপকরণে সাহিত্যসৃষ্টির প্রতিভার অভাব, অথবা অন্য রকম সৃষ্টির দিকে প্রতিভার ঝোঁক। শক্তিতে যা কুলোয় না, তার চেষ্টা না-করা ভীরুতা নয়, সুবুদ্ধি— কি জীবনে কি সাহিত্যে। 'এস্কেপিস্ট' কাব্য যদি 'আইভরি টাওয়ার'-এ উঠেও কাব্য হয়, তবে তা সার্থক, হোক না তার ধারা শীর্ণ। বড়ো চেষ্টার ব্যর্থতা যে ছোটো সাফল্যের চেয়ে বড়ো, সাহিত্যে সে কথা বলা চলে না। আর সাহিত্যের চেহারা তো এক নয়, সে বহুরূপী। লক্ষ্মী কেন দশভুজা হল না, এ আপসোস বৃথা।

বিদেশে ও দেশে অনেক আধুনিক কবি সমাজে ও জীবনে ও সৃষ্টিতে যে অসংগতি ও কুশ্রীতা, তার তিক্ততাকে কাব্যের উপচার করছেন। এ অসংগতি ও কুশ্রীতা যখন সৃষ্টির অংশ, তখন একে কাব্যের রূপ দিতে পারলে সে কাব্য যে হবে সার্থক কাব্য, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যে-সব সমালোচক সাহিত্যের শ্রেণীভাগ ও নামকরণের ব্যবসা করেন, তাঁদের বলতেই হবে যে, এ কাব্যও এস্কেপিস্ট কাব্য; আর এ কাব্য চরম রিয়ালিজম্ নয়, পরম সেন্টিমেন্টাল। জীবনে ও সৃষ্টিতে সবই কুশ্রী নয়, সৌন্দর্যও আছে। এ কাব্য তা থেকে পলায়ন। দোষের কিছু নয়, বিশেষ মূড্-এর কাব্য-রচনায় এ রকম পলায়ন কবিকে

করতেই হয়। কিন্তু এ কাব্যের সুরে আছে জীবন ও সৃষ্টি যে রকম, সে রকম কেন হল, তাই নিয়ে নালিশ। শরীরের সুষমা যে কঙ্কালকে ঢেকে রেখেছে, নরনারীর প্রেমের মূলে যে কাম, তার পীড়া এ কাব্যের ধ্বনি। কুশ্রী ও সৌন্দর্য, বীভৎস ও মাধুর্য, নিষ্ঠুর ও মৈত্রী—সৃষ্টির এই বিষামৃতের বিস্ময় এ কাব্যে নেই। সমস্ত সৃষ্টি কেন প্রেমিকের স্বপ্ন নয়, এ কাব্যে সেই অভিযোগ।

এক দিন ছিল, যখন মানুষ মনে করত তার এ পৃথিবী সৃষ্টির মধ্যমণি। সূর্য চন্দ্র তারা তাকেই ঘিরে রয়েছে। বিশ্বের সকল গতিবিধি হচ্ছে পৃথিবীর রাজা মানুষের মঙ্গল-অমঙ্গলের মন্ত্রণা। সে দিন এ অভিমানের হয়তো অর্থ ছিল, বিশ্বসৃষ্টি মানুষের মনের মতো নয় কেন। আজ মানুষ জেনেছে, তার এ পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের একান্ত শূন্যে সমুদ্রের বালুতীরের এক কণা পুরো বালুও নয়। তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বড়ো শতলক্ষ পৃথিবীর এক কোণে সে রয়েছে; সেখান থেকে মুছে গেলে ব্রহ্মাণ্ডের শূন্যতা যে কিছু বাড়লো, তা লক্ষ্যও হবে না। এই পৃথিবীতে মানুষ এসেছে অল্পদিন। থাকবেও না চিরদিন। যেদিন তাপহীন ও বায়ুশূন্য হয়ে তার গতিপথে পৃথিবী ঘুরবে, তার অনেক আগে এখান থেকে মানুষ লোপ হবে। সৃষ্টি কেন মানুষের মনোমতো নয়, এ অভিযোগ আজ নিদারুণ পরিহাস। সৃষ্টি যা আছে তাই, কেন এ রকম, সে প্রশ্নের অর্থ নেই। এর সবই যে নিষ্ঠুর ও বীভৎস নয়, সেই আমাদের সৌভাগ্য। কঙ্কালকে ঘিরেও যে থাকে শরীরের সুষমা, কামের পাঁকেও যে প্রেমের পদ্ম ফোটে, কৃতজ্ঞ মনে তাই স্মরণ করতে হবে, কাব্যে না হোক জীবনে।